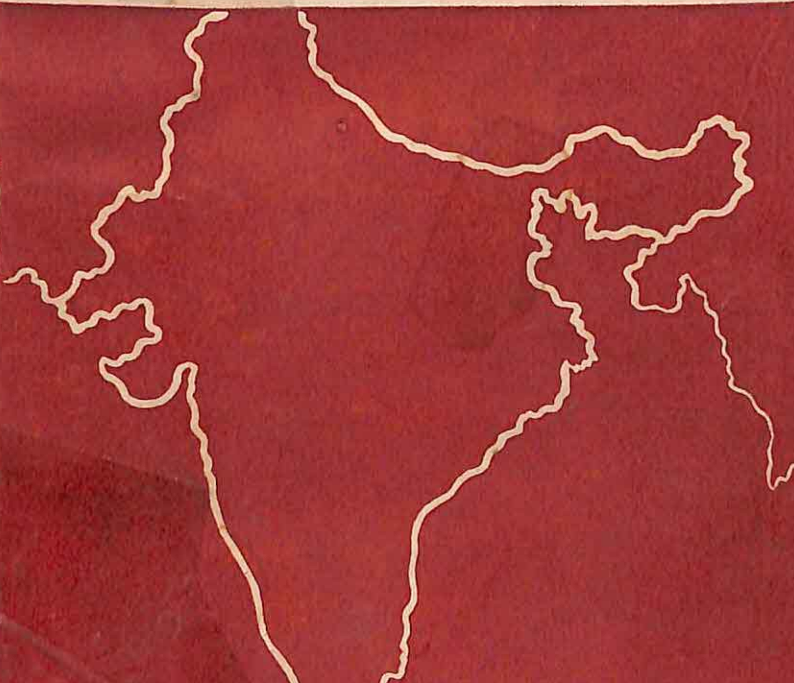
ভারত কথা

প্রথম ভাগ

সপ্তম শ্রেণীর জন্য



ডক্টর অতুল চন্দ্র রায়

[পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক ১৯৭৪ সালের মে মাসে রচিত নূতন সিলেবাস অনুসারে সপ্তম শ্রেণীর জন্য লিখিত।]

ভারত-কথা

(প্রথম ভাগ)

[সপ্তম শ্রেণীর জন্য]

অতুলচন্দ্র রায়, এম. এ., পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন)
স্যার আশুতোষ গোল্ড মেডালিস্ট
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রান্তিক
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
প্রান্তিক
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ—নভেম্বর, ১৯৭৪

মূল্য : পাঁচ টাকা পঁচাত্তর পয়সা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীদুলালচন্দ্র ভূঁঞা
সুদীপ প্রিন্টার্স
৪/১-এ, সনাতন শীল লেন,
কলিকাতা-১২

INDIA AND HER PEOPLE

HISTORY

(Revised)

CLASS VII

From the earliest times to the death of Aurangzib (1707)

A. (*i*) Antiquity of India and Her Civilisation. (bare outline) [2 Pages]

(*ii*) Indus Valley Civilisation : Social, Religious and Economic life of the Indus Valley People. [4 Pages]

(*iii*) The Vedic Aryans : Vedic Literature and Religion : Social and Economic Life of the people. Later Vedic Literature. The Epics [6 Pages]

(*iv*) Life and Teachings of Mahavira and Buddha. [4 Pages]

(*v*) Bare outline of the General History during the period of :— [16 Pages]

(a) Bimbisar to Asoke.
(b) Kanishka.
(c) Chandragupta I to Skandagupta.
(d) Harshabardhan to Mahendrapala Pratihara.
(e) Sasanka of Gauda to Devapala.

(*vi*) Social and Cultural Life of the people as revealed in Arthasastra and accounts of Megasthanis, Fa-Hien and Hiuen-Tsang. [6 Pages]

(*vii*) The Gupta Period : The Golden Age : Literature, Art and Science. [4 Pages]

B. India and her neighbours : Idea of Greater India and her relation with Central Asia, East Asia, Ceylon and Tibet. [6 Pages]

C. Resistance against foreign invasions : Porus, Chandragupta Maurya, Gautamiputra Satkarni, Chandragupta II, Yasodharmana, Skandagupta, Dahir of Sindh, Jaipal and Anandapal, Prithwiraj Chauhan. [14 Pages]

D. Bengal—Society and Culture in the Pala and the Sena Periods. [8 Pages]

E. South India (in bare outline) –Achievement of the Chalukyas, Pallavas, Rastrakutas and Cholas. [10 Pages]

F. (a) Life and teachings of Hazrat Muhammad.
(b) Sultan Mahamud of Ghazni : Mahmud of Ghur, the slave Kings of Delhi, the Khaljis, the Tughluqs and the Lodis. [18 Pages]

G. Vijoynagar and Bahamani Kingdoms (in bare outline). [4 Pages]

H. Religious and Social Reformers—Ramananda, Kabir, Chaitanya, Nanak, Ramdas. [8 Pages]

I. The Mughals :—Babur, resistance by Sangram Singha : Humayun, Shershah, Akbar—his conquest, Rana Pratap's resistance : Jehangir – Sahajahan—Aurangzib : Rise of the Marathas : Sivaji—Death of Aurangzib 1707. [25 Pages]

Total number of pages of matters and illustrations should not exceed 150 pages (Matters 135 and 15 pages of illustrations : Pica Type—Double Demy).

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক রচিত সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যসূচী অনুযায়ী বর্তমান পাঠ্যপুস্তকখানি (**ভারত-কথা** প্রথম ভাগ) রচিত হইয়াছে। পাঠ্যসূচীতে উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়বস্তু সতর্কতার সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। প্রতিটি অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের পৃষ্ঠার নির্দেশ যথা সম্ভব পালন করা হইয়াছে।

আশা করি পাঠ্যপুস্তকখানি ছাত্র-ছাত্রীদের উপকারে আসিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
অক্টোবর, ১৯৭৪

—ইতি
শ্রীঅতুলচন্দ্র রায়

সূচীপত্র

ভারত-কথা

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

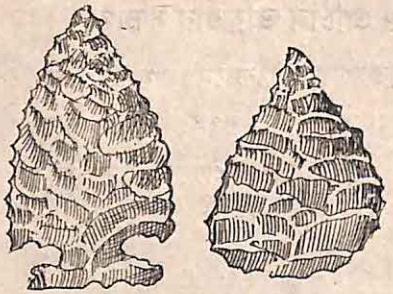
প্রাগৈতিহাসিক ভারত ও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা

পৃথিবীর কয়েকটি প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থানের মধ্যে ভারত অন্যতম। খ্রীষ্টজন্মের তিন সহস্র বা ততোধিক বৎসর পূর্বে ভারতে সিন্ধু-সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল। এই সভ্যতা নগরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। তখন জনগণের জীবনধারণের মান ছিল খুবই উন্নত। ইহা ছাড়া, বৈদিক যুগে বহিরাগত আর্যদের সহিত প্রাচীন ভারতবাসীর দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম চলিয়াছিল। আর্যগণ প্রাচীন ভারতীয়দের নামকরণ করিয়াছিল দৈত্য, অসুর, রক্ষ, যক্ষ, দানব ইত্যাদি। সুতরাং, আর্য-সভ্যতা—তথা সিন্ধু-সভ্যতার বহু পূর্বেই যে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আয়তনের দিক দিয়া ভারত একটি সুবিশাল দেশ এবং ইহার জনসংখ্যাও বিপুল। প্রাচীন সাহিত্যে ভারতের উল্লেখ আছে। বিষ্ণু-পুরাণে উল্লেখ আছে—যে দেশ হিমালয়ের দক্ষিণে ও সমুদ্রের উত্তরে অবস্থিত এবং যে দেশে রাজা ভরতের সন্তান-সন্ততি বাস করে তাহা **ভারতবর্ষ** বা **ভারত** নামে পরিচিত। ব্রহ্মপুরাণে উল্লেখ আছে যে সমুদ্রের উত্তরে ও হিমালয়ের দক্ষিণে যে 'বর্ষ' বা দেশ অবস্থিত তাহা ভারতবর্ষ নামে খ্যাত। সুতরাং ভারতবর্ষ বা ভারত যে একটি প্রাচীন দেশ সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

প্রাচীন সভ্যতার রূপ ঃ ভারতের প্রাচীন অধিবাসিগণ দৈনন্দিন জীবনে যে সকল সরঞ্জাম ব্যবহার করিত তাহার নিদর্শন হইতেই উহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল সরঞ্জামের প্রকৃতি অনুযায়ী পণ্ডিতরা ভারতের আদিম অধিবাসিগণকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন ; যথা—**পুরাতন প্রস্তরযুগের** মানুষ, **নূতন প্রস্তরযুগের** মানুষ ও **ধাতুযুগের** মানুষ। এই এক একটি যুগের মেয়াদ ছিল প্রায় কয়েক হাজার বৎসর।

পুরাতন প্রস্তরযুগে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির ন্যায় ভারতেও সভ্যতার প্রথম বিকাশ ঘটে। পুরাতন যুগের মানুষ ছিল গুহাবাসী এবং কাঁচা ফল-মূল ও পশুর মাংসই ছিল উহাদের একমাত্র খাদ্য। হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণ হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য এবং উহাদিগকে শিকার করিবার জন্য এই যুগের মানুষ সাধারণ প্রস্তরনির্মিত অমসৃণ হাতিয়ার ব্যবহার করিত।



পুরাতন প্রস্তরযুগের অস্ত্র

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের হাতিয়ার পাওয়া গিয়াছে। অনেকে মনে করেন পুরাতন প্রস্তরযুগের মানুষেরা **নেগ্রিটো** জাতি-গোষ্ঠীভুক্ত ছিল। আন্দামানে ইহাদের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহাদের চেহারা ছিল খর্ব, রং ঘোর কালো, দেহের তুলনায় হাত সুদীর্ঘ এবং নাক থ্যাবড়া। এই যুগের মানুষেরা ভারতে গুহাচিত্রের সূত্রপাত করিয়াছিল। ভারতের মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত সিঙ্গনপুর গ্রামের গিরিগুহায় পুরাতন প্রস্তরযুগের কয়েকটি চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।



সিঙ্গনপুর গুহাচিত্র

পুরাতন প্রস্তরযুগের পর আসিল **নূতন প্রস্তরযুগ**। এই যুগে প্রস্তরখণ্ডকে মসৃণ করিয়া বর্শা, কুঠার, প্রভৃতি ধারাল অস্ত্র প্রস্তুত হইল এবং তীর ও ধনুকের ব্যবহার শুরু হইল। এই যুগের মানুষেরা আগুনের ব্যবহার জানিত,



নূতন প্রস্তরযুগের অস্ত্র

মৃৎপাত্র নির্মাণ করিতে পারিত এবং কৃষিকার্যও জানিত। ভারতের সিন্ধু-উপত্যকায় এই যুগের সূচনা হইয়াছিল। কোল, ভীল, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতি ইহাদের বংশধর।

নূতন প্রস্তরযুগের পর আসিল **ধাতুযুগ**। এই যুগে প্রস্তরের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে ধাতুর ব্যবহারও প্রচলিত হয়। উত্তর ভারতে প্রস্তরের পরিবর্তে তাম্রের প্রচলন শুরু হয়। অস্ত্র-শস্ত্র ও চাষ-আবাদের উপযোগী সরঞ্জামও তাম্র দ্বারা নির্মিত হইত। বহুকাল পরে তাম্রের পরিবর্তে লৌহের ব্যবহার শুরু হয়। নাগপুর, হায়দরাবাদ ও মহীশূর অঞ্চলে এই যুগের নির্মিত কিছু অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। তাম্রযুগের সঙ্গে দ্রাবিড়-সভ্যতা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অনেকের মতে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়গণ এই যুগের মানুষেরই বংশধর। ধাতুযুগের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক যুগও শুরু হয়।

অনুশীলনী

১। ভারতের আদিম অধিবাসিগণ কাহারা? উহাদের সম্বন্ধে কি জান?

২। পুরাতন প্রস্তরযুগের সভ্যতার রূপ বর্ণনা কর।

৩। কোন্ যুগের মানুষেরা গুহাচিত্রের সূত্রপাত করিয়াছিল?

৪। ধাতুযুগের বিষয়ে কি জান?

৫। ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্বের প্রমাণ কি?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সিন্ধু-সভ্যতা

আবিষ্কার ঃ আর্যদের আগমনের বহু পূর্বেই ভারতে এক উন্নত নাগরিক সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল। সিন্ধুনদের উপত্যকায় এই সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া ইহা **সিন্ধু-সভ্যতা** নামে অভিহিত। ভারতের প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধুদেশের লারকানা জেলার মহেঞ্জোদাড়ো (মহেঞ্জোদাড়ো শব্দের অর্থ 'মৃতের স্তূপ') নামক স্থানে এক বিরাট স্তূপ দেখিতে পান। 'মহেঞ্জোদাড়ো' নামটি রহস্যময় মনে করিয়া তিনি ঐ স্থানে খননকার্য শুরু করেন। খনন-কার্যের ফলে আবিষ্কৃত হয় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেকার এক বিরাট শহরের ধ্বংসাবশেষ। পাঞ্জাব প্রদেশের মণ্টগোমারি জেলার অন্তর্গত হরপ্পা নামক স্থানেও অনুরূপ একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। এই শহরটিও সিন্ধুর উপনদী ইরাবতীর তীরে অবস্থিত। শহর দুইটির ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শহর দুইটি কয়েকবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং পুরাতন শহরের ভিত্তির উপরেই নূতন শহর গড়িয়া উঠিয়াছিল।

সিন্ধু-সভ্যতার ভাষা ও কাল ঃ এই সভ্যতার সমসাময়িক কোন লিখিত ইতিহাস নাই। সিন্ধু-উপত্যকায় অক্ষরবিশিষ্ট কিছু সীলমোহর, মৃৎপাত্র এবং পশুর প্রতিচ্ছবি বিশিষ্ট কতকগুলি তাম্রপাত্রের টুকরা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু অক্ষরগুলির পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভব হয় নাই। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, খ্রীষ্টজন্মের তিন সহস্র বা ততোধিক বৎসর পূর্বে সিন্ধু-সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল।

সিন্ধু-সভ্যতার স্রষ্টা ঃ সিন্ধু-সভ্যতা কাহারা গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। অনেকে মনে করেন সুমেরীয়

জাতি এই সভ্যতার স্রষ্টা। কাহারও কাহারও মতে দ্রাবিড়গণই এই সভ্যতার প্রবর্তক। আবার অনেকের মতে আর্যগণই এই সভ্যতার স্রষ্টা। প্রকৃতপক্ষে মহেঞ্জোদাড়োতে তিনটি জাতির অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে; যথা—ভূমধ্যসাগরীয় জাতি, ককেশীয় জাতি এবং তৃতীয়টি অজ্ঞাত জাতি। মনে হয় সিন্ধু-সভ্যতা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির দ্বারাই সৃষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়াছিল।

সিন্ধু-সভ্যতার চিত্র ঃ সিন্ধু-সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক। পারস্যের মেকরান উপকূল হইতে দক্ষিণে কাথিয়াবাড় এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার নগর দুইটি বিস্তৃত ছিল এবং জনবহুল ও ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ ছিল। নগর দুইটির গৃহগুলি ছিল ইষ্টকনির্মিত ও সুপরিকল্পিত। কাঁচা ও পোড়ান, দুই রকম ইষ্টকই গৃহগুলিতে ব্যবহার করা হইয়াছে। নগরীর রাজপথগুলি ছিল সুপ্রশস্ত এবং নগরীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত। রাজপথের দুই ধারে দালানগুলি ছিল সারিবদ্ধ। প্রতিটি আবাসগৃহ উদ্যান-সংলগ্ন ও প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। নগরীর জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিল চমৎকার। রাস্তার দুই ধারে পাথর দিয়া ঢাকা পাকা পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা ছিল। বড় বড় গৃহে পাকা স্নানাগার ছিল। মহেঞ্জোদাড়োতে আবিষ্কৃত স্নানাগারটি বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ইহা ছিল চতুষ্কোণ ও প্রস্তরবেষ্টিত এবং মধ্যস্থলে ছিল জলাধার। জলাধারের চারিদিকে ছিল ইষ্টকনির্মিত প্রকোষ্ঠ।

নগরবিন্যাস



পয়ঃপ্রণালী

নগরবিন্যাস-পদ্ধতি ও বাসগৃহের পরিকল্পনা দেখিয়া মনে হয় নাগরিকগণ ছিল বিলাসী ও সমৃদ্ধ। পৌরজীবনের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য

উহারা উপভোগ করিত। একই ধরনের রাস্তার পরিকল্পনা ও একই ধরনের বাসগৃহ দেখিয়া মনে হয় যে একই ধরনের শাসনব্যবস্থা নগর দুইটিতে প্রচলিত ছল।

মাটির নীচে খেজুর, তরমুজ ও অন্যান্য ফসলের বীজও পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং সিন্ধুবাসীগণ কৃষিকার্যের সহিতও সুপরিচিত ছিল।

খাদ্য ও জীবিকা

গম ও যব জাতীয় খাদ্যই সিন্ধুবাসীদের প্রধান খাদ্য ছিল। মৎস্য ও মাংস উহাদের প্রিয় ছিল। রন্ধনের জন্য উহারা ধাতুপাত্র ও মৃৎপাত্র ব্যবহার করিত। মাটি, প্রস্তর ও ধাতুনির্মিত পাত্রাদি তৈয়ারী করিয়া তাহাতে উহারা নানা চিত্র অঙ্কন করিত। এই সকল প্রমাণ হইতে মনে হয়, সিন্ধুবাসীরা শিক্ষিত, শিল্পদক্ষ ও সুসভ্য ছিল।

পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার

সিন্ধুবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার ও বিলাস-সামগ্রী উন্নত ধরনের ছিল। মহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত প্রস্তর, মাটি ও ব্রোঞ্জের মূর্তির বেশভূষা দেখিয়া মনে হয় পুরুষেরা সূতার কাপড় পরিধান করিত ও চাদর ব্যবহার করিত। প্রধানতঃ উহারা সূতীবস্ত্র ও পশম ব্যবহার করিত। নারীরা ঘাঘ্‌রা পরিধান করিত ও কোমরে মেখলা বাঁধিত। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই নানারকম অলঙ্কার ব্যবহার করিত। নারীদের প্রধান অলঙ্কার ছিল কানপাশা, কোমরবন্ধ ও গলার হার। মহেঞ্জোদাড়োতে প্রচুর স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও গজদন্ত নির্মিত অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছে।



অলঙ্কার

যুদ্ধাস্ত্র

সিন্ধুবাসীরা যে যুদ্ধবিদ্যায় উন্নত ছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ব্রোঞ্জ ও তাম্র নির্মিত কুঠার ও বর্শা পাওয়া গিয়াছে।

সিন্ধুবাসীরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী হইলেও উহাদের মধ্যে শিল্প ও

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। পশুপালনও উহাদের অপর এক বৃত্তি ছিল। জলপথে মিশর ও স্থলপথে বেলুচিস্তান, সুমেরীয় অঞ্চল এবং দক্ষিণে মহীশূর প্রভৃতি দেশের সহিত সিন্ধুবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। সিন্ধুবাসীরা শ্রমশিল্পেও উন্নত ছিল। পালিশ-করা পোড়ামাটির উপর নানা জীবজন্তু, মানুষের মূর্তি, লতা-পাতা ও পাখীর চিত্র অঙ্কিত দেখা যায়। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, মহিষ, ভেড়া, হাতী ও শূকর উল্লেখযোগ্য।

জীবিকা

সিন্ধুবাসীদের ধর্ম সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না। মহেঞ্জোদাড়ো বা হরপ্পার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তবে কতকগুলি অট্টালিকা উপাসনাগৃহ বলিয়া অনুমান করা হয়। নানাবিধ দ্রব্যে ও সীলমোহরে স্ত্রী-মূর্তির আধিক্য দেখিয়া মনে হয় উহাদের মধ্যে মাতৃপূজার প্রচলন ছিল। দেবদেবীজ্ঞানে বৃক্ষ, পাথর, সর্প এবং বহু পশু-পক্ষীর উপাসনাও প্রচলিত ছিল। কতকগুলি সীলমোহরে দেখা যায়, এক দেবতা যোগাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার মাথায় তিনটি শিং ও তিনি বহুবিধ জন্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহাতে মনে হয় সিন্ধুবাসীদের মধ্যে পশুপতি শিবের পূজা প্রচলিত ছিল। পশুপতি শিবের সহিত জগন্মাতার পূজাও প্রচলিত ছিল। সিন্ধু-সভ্যতার সমাজব্যবস্থা ছিল মাতৃকেন্দ্রিক; অর্থাৎ সমাজে নারীদের প্রাধান্য ছিল বেশী। সিন্ধুবাসীগণ পরলোকে বিশ্বাস করিত। মৃতদেহ সমাধিস্থ বা দাহ করা—উভয় প্রথাই প্রচলিত ছিল। কখনও বা মৃতদেহ পশু-পক্ষীর আহারের জন্য উন্মুক্ত স্থানে রাখা হইত।

ধর্ম ও সমাজ

সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসের কারণ সঠিক জানা যায় না। সম্ভবতঃ জলপ্লাবন, মহামারী প্রভৃতি, নৈসর্গিক কারণেই এই সভ্যতার বিনাশ ঘটে।

সিন্ধু-সভ্যতার বিনাশ

সমসাময়িক সভ্যতার সহিত সিন্ধু-সভ্যতার যোগাযোগ : মিশরীয় ও সুমেরীয় সভ্যতার সহিত সিন্ধু-সভ্যতার সাদৃশ্য দেখা যায়। মিশরের অনুকরণে নির্মিত টুল ও দীপাধার মহেঞ্জোদাড়োতে পাওয়া গিয়াছে।

উন্নত ধরনের নাগরিক জীবন, বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার, চিত্রমূলক বর্ণমালা প্রভৃতি মিশরীয় ও সুমেরীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলি সিন্ধু-সভ্যতায় প্রচলিত দেখা যায়। মহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত সীলমোহরের অনুরূপ কতকগুলি সীলমোহর ব্যাবিলন ও সুমেরীয় অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে মনে হয় পশ্চিম এশিয়ার সমসাময়িক সভ্যতার সহিত সিন্ধু-সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

অনুশীলনী

১। সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কার কিরূপে হয়? এই সভ্যতার বিবরণ সংক্ষেপে লিখ।

২। ভারতের কোন্ অঞ্চলে সিন্ধু-সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল? এই সভ্যতার স্রষ্টা কাহারা?

৩। সিন্ধুবাসীদের নাগরিক ও অর্থ নৈতিক জীবন বর্ণনা কর।

৪। 'সিন্ধুবাসীরা শিক্ষিত, শিল্পদক্ষ ও সুসভ্য ছিল'—ইহার সত্যতা প্রমাণ কর।

৫। সিন্ধুবাসীদের ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা কর।

৬। সমসাময়িক সভ্যতার সহিত সিন্ধু-সভ্যতার কি সাদৃশ্য দেখা যায়?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আর্য-সভ্যতা

সিন্ধু-সভ্যতার পর ভারতে যে সভ্যতার বিকাশ ঘটে তাহা **বৈদিক সভ্যতা** বা **আর্য-সভ্যতা** নামে পরিচিত। কি কি কারণে সিন্ধু-সভ্যতার বিনাশ ঘটিয়াছিল তাহা সঠিক বলা যায় না। অনেকে মনে করেন আকস্মিক প্লাবন বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সিন্ধু-সভ্যতার বিনাশ ঘটিয়াছিল।

পণ্ডিতদের মতে বহুকাল পূর্বে ল্যাটিন, সংস্কৃত, ইরানী প্রভৃতি প্রাচীন ভাষাগুলি একটি মূল ভাষা হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে।

আর্যদের পরিচয়

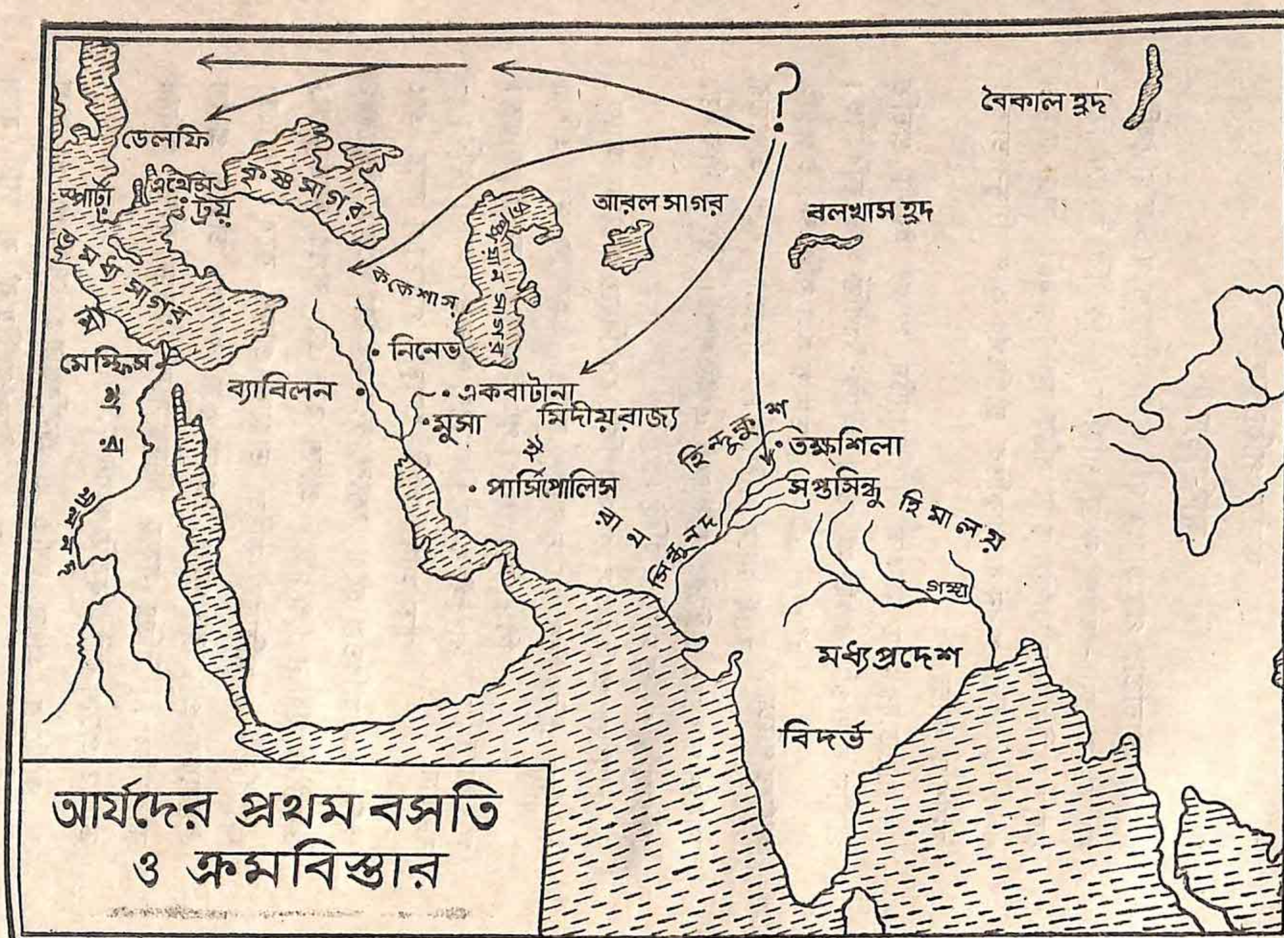
যাঁহারা এই আদিভাষায় কথা বলিতেন, তাঁহারাই **আর্য** নামে পরিচিত। পণ্ডিতদের মতে ভারতের আর্যগণ ভারতের বাহিরের আর্যদেরই একটি শাখা। ইহারা দীর্ঘকায়, গৌরকান্তি ও উচ্চ নাসিকাবিশিষ্ট।

আর্যদের আদিনিবাস কোথায় ছিল, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন আর্যরা এককালে মধ্য এশিয়া কিংবা মধ্য অথবা পূর্ব ইওরোপে বসবাস করিত।

আর্যদের আদি-বাসস্থান

পরবর্তী কালে খাদ্যাভাব, স্থানাভাব অথবা গৃহবিবাদ-হেতু আর্যরা আদি বাসভূমি পরিত্যাগ করে এবং বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া দেশদেশান্তরে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদেরই একটি দল ইরানে (পারস্য) প্রবেশ করে এবং অপর আর একটি দল গিরিপথ অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করে। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টজন্মের প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া বসতি স্থাপন করে।

আর্যদের প্রথম বসতি ও ক্রমবিস্তারঃ আর্যদের যে অংশ ভারতে প্রবেশ করে তাহারা **'ইন্দো-আরিয়ান'** বা **আর্য** নামে পরিচিত হয়। আর্যরা ভারতে আসিয়া দ্রাবিড়গণকে পরাস্ত করে



আর্যদের প্রথম বসতি
ও ক্রমবিস্তার

এবং 'সপ্তসিন্ধু' অঞ্চলে প্রথম বসতি স্থাপন করে। আফগানিস্তানের সীমান্ত হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত এই অঞ্চলকে 'সপ্তসিন্ধু' বলা হইত। পরবর্তী কালে আর্য-সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ছিল মধ্যদেশ অর্থাৎ সরস্বতী নদী হইতে গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড। ক্রমে ক্রমে কুরুক্ষেত্র (দিল্লীর সন্নিকটে), কোশল (বর্তমান অযোধ্যা), কাশী, বিদেহ (উত্তর বিহার), মগধ (দক্ষিণ বিহার) প্রভৃতি অঞ্চলে আর্যগণ বসতি স্থাপন করে।

বৈদিক সাহিত্যঃ আর্যদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের নাম **বেদ**। হিন্দুদের মতে বেদ মানুষের রচনা নহে, ইহা ঈশ্বরের বাণী। 'বিদ্' শব্দের অর্থ (জ্ঞান) হইতেই 'বেদ' কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচীন ঋষিগণ ইহাকে ঈশ্বরের নিকট হইতে শ্রুত বাণী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এইজন্য বেদের অপর নাম **'শ্রুতি'**। বেদ ও বেদাঙ্গ লইয়াই বৈদিক সাহিত্য। বেদ চারিটি গ্রন্থে বিভক্ত—**ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব**। প্রতিটি বেদ আবার চারিখণ্ডে বিভক্ত,—যথা, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। দেবতার স্তুতি, সুখ ও শান্তির জন্য প্রার্থনা, যাগ-যজ্ঞের পদ্ধতি, রাজার অভিষেক প্রভৃতির বর্ণনা—এইসব লইয়াই বেদ। **ঋক্‌বেদ** সর্বাধিক প্রাচীন। ইহা পদ্যে রচিত। ইহার অনেকগুলি মন্ত্র বা স্তোত্র লইয়া **সামবেদ** রচিত হয়। সামবেদের মন্ত্রগুলি যজ্ঞকালে সঙ্গীতের স্বরে উচ্চারিত হইত। **যজুর্বেদে** যজ্ঞের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। সর্বশেষে রচিত হয় **অথর্ববেদ**। ইহাতে শত্রুদমন, বিপদনিবারণ ও অন্যান্য বিষয়ের বিভিন্ন মন্ত্র সন্নিবিষ্ট আছে। বেদের ব্রাহ্মণ-অংশ গদ্যে রচিত। ইহাতে বৈদিক মন্ত্রগুলির টীকা সন্নিবিষ্ট আছে। আরণ্যকে বাণপ্রস্থ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। **উপনিষদে** দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে মানুষের সুখ-দুঃখ, সৃষ্টির কারণ, ঈশ্বরের স্বরূপ, জ্ঞান ও মুক্তির উপায় প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আছে। বেদের মধ্যে বহু দেবতার নাম থাকিলেও, উপনিষদে 'ব্রহ্মবাদ' আলোচিত হইয়াছে। সমগ্রভাবে

বেদের চারিভাগ

উপনিষদ

উপনিষদগুলি বেদের অন্ত বা শেষ অংশ বলিয়া উপনিষদের অপর নাম **বেদান্ত**।

বেদাঙ্গ

চতুর্বেদ ভিন্ন **বেদাঙ্গ**ও বৈদিক সাহিত্যের অঙ্গ। বেদাঙ্গের ছয়টি ভাগ; যথা—শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও কল্প। বৈদিক যুগের **দর্শন-সাহিত্য** ছয়টি ভাগে বিভক্ত; যথা—সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা। কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম, কর্ণাদ, জৈমিনি ও ব্যাস যথাক্রমে এই **ষড়দর্শনের** রচয়িতা। বেদাঙ্গ ও ষড়দর্শন একত্রে **সূত্র-সাহিত্য** নামে পরিচিত।

বহু রাজ্যের উৎপত্তি

আর্যদের রাজনৈতিক জীবন ঃ প্রথম দিকে আর্যগণ বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত ছিল। কোশল, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, বিদেহ, বিদর্ভ প্রভৃতি নামে বহু রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এই সকল রাজ্যের রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রায় লাগিয়াই থাকিত। সার্বভৌমত্ব লাভের জন্য রাজারা সময় সময় রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন।

গ্রাম ও রাষ্ট্র

বৈদিক যুগে সমাজ ও রাষ্ট্র ছিল একটি বৃহৎ পরিবারের মত। 'গ্রামণী' ছিলেন গ্রামের কর্তা। গ্রামণী গ্রামের বিজ্ঞ লোকদের সাহায্যে গ্রামের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন রাজা। কর আদায়, বিচার-কার্য, যুদ্ধ-পরিচালনা ও ধর্মরক্ষা প্রভৃতি রাজার প্রধান দায়িত্ব ছিল। রাজকার্যে সেনানী ও পুরোহিত নামে রাজকর্মচারিগণ রাজাকে সাহায্য করিতেন। রাজপদ বংশানুক্রমিক ছিল। রাজা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। দুইটি জনসভা রাজার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিত—'সভা' ও 'সমিতি'। শাসন, বিচার ও জনহিতকর কার্য সংক্রান্ত ব্যাপারে এই সংস্থা দুইটি অংশ গ্রহণ করিত।

আর্যদের সামাজিক জীবন ঃ আর্যদের সমাজব্যবস্থা বেশ উন্নত ছিল। পরিবারের প্রধান ছিলেন পিতা। পরিবারের সকলের উপর

তাঁহার ক্ষমতা ছিল সীমাহীন। আর্য সমাজে নারী যথেষ্ট সম্মানের অধিকারিণী ছিল। নারীদের মধ্যে অবরোধ প্রথার প্রচলন ছিল না। তাহারা উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিত। সাহিত্য ও কাব্য চর্চা ছাড়াও নারীগণ যুদ্ধবিদ্যা, অসিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিত। অনেক নারী অবিবাহিতা থাকিয়া লেখাপড়ার চর্চা করিত। ইহাদের ব্রহ্মবাদিনী বলা হইত। বিশ্ববরা, ঘোষা, অপলা, লোপামুদ্রা প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনীর নাম বেদে পাওয়া যায়।

সমাজে নারীর স্থান

প্রথমদিকে আর্যদের মধ্যে বর্ণভেদ বা শ্রেণীভেদ ছিল না। ইহার পর কর্ম বা পেশা অনুসারে সমাজকে চারি ভাগে ভাগ করা হয়। যাঁহারা বিদ্যাচর্চা ও যাগ-যজ্ঞাদি লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন তাঁহারা **ব্রাহ্মণ** নামে পরিচিত হন। যাঁহারা যুদ্ধকার্যে নিযুক্ত থাকিতেন তাঁহারা **ক্ষত্রিয়** নামে পরিচিত হন। যাঁহারা কৃষি, পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য পেশা রূপে গ্রহণ করিতেন তাঁহারা **বৈশ্য** নামে পরিচিত হন। যাঁহারা এই তিন শ্রেণীর সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন তাঁহারা **'দাস'** বা **শূদ্র** নামে পরিচিত হন।

বর্ণভেদ ও শ্রেণীভেদ

চতুরাশ্রম আর্যদের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইহা সমাজের প্রথম তিন শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জীবনের প্রথম পর্যায়কে বলা হইত **ব্রহ্মচর্যাশ্রম**; দ্বিতীয় পর্যায়কে বলা হইত **গার্হস্থ্যাশ্রম**; তৃতীয় পর্যায়কে বলা হইত **বাণপ্রস্থাশ্রম** এবং শেষ পর্যায়কে বলা হইত **সন্ন্যাস** বা **যতি** আশ্রম।

বৈদিক যুগে আর্যগণ তূলা ও চর্মনির্মিত পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। সেযুগে অলঙ্কারেরও প্রচলন ছিল। অলঙ্কারের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত অলঙ্কারের প্রচলনই ছিল বেশী। দুগ্ধ, ঘৃত, ফলমূল, যব ও গম আর্যদের প্রধান খাদ্য ছিল। উৎসবের সময় পশুর মাংসেরও প্রচলন ছিল। যাগ-যজ্ঞাদির সময় আর্যরা সোমরস বা সুরা নামক পানীয় ব্যবহার করিত। সোমলতা হইতে সোমরস

প্রস্তুত করা হইত। আমোদ-প্রমোদের মধ্যে রথ-চালনা, মৃগয়া, নৃত্যগীত ও পাশাখেলার প্রচলন ছিল। নৃত্যগীতের সময় 'বীণা' এবং 'ঢাক' প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

আর্যদের অর্থনৈতিক জীবন ঃ বৈদিক যুগে আর্যদের জীবন সরল ও অনাড়ম্বর ছিল। কৃষি ও পশুপালন ছিল উহাদের প্রধান উপজীবিকা। জনসাধারণ ছিল পল্লীবাসী। প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবারের নিজস্ব কৃষিজমি ছিল। গো-ধন ছিল উহাদের বড় সম্পদ। **পাণি** নামক এক শ্রেণীর লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। প্রধান পণ্যসামগ্রী ছিল সূতীবস্ত্র ও চামড়া। ঋগ্বেদে সূত্রধর, ধাতুশিল্পী, তন্তুবায় ও কুম্ভকারের উল্লেখ পাওয়া যায়। ধাতুর মধ্যে স্বর্ণ, তাম্র ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার অধিক ছিল। আর্যগণ সামুদ্রিক বাণিজ্যের সহিতও পরিচিত ছিল। ঋগ্বেদে সমুদ্রপোতের উল্লেখ আছে। বৈদিক সাহিত্যে **নিষ্ক** ও **মানা** নামক মুদ্রার উল্লেখ আছে।

আর্যদের ধর্ম ঃ বেদের যুগে আর্যরা বহু দেবতার উপাসনা করিত। তাহারা দেবদেবীজ্ঞানে প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির প্রকাশকে—যেমন পৃথিবী, মরুৎ, রুদ্র, অগ্নি, ইন্দ্র ইত্যাদির উপাসনা করিত। দেবতার উদ্দেশ্যে হোম বা যাগ-যজ্ঞ করিয়া দেবতার দয়া প্রার্থনা করা হইত। সাধারণতঃ ঘৃত, যব ও মধু যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইত।

মহাকাব্য—রামায়ণ ও মহাভারত

রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের প্রথম দুইটি মহাকাব্য। রামায়ণ ও মহাভারতের কাল বৈদিক যুগেরই অংশবিশেষ। বৈদিক **সূত্রসাহিত্যে** মহাকাব্যে বর্ণিত কোন কোন ঘটনার উল্লেখ আছে। বৈদিক সাহিত্যে বীরপুরুষ ও পুণ্যবতী নারীদের উদ্দেশ্যে রচিত লোক-সংগীত ও উপন্যাস অবলম্বনে মহাকাব্য দুইটির উৎপত্তি হইয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে মহাকাব্য দুইটি রচিত হইয়াছিল।

মহাকাব্য দুইটির রচনাকাল

বাল্মীকি রচিত 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' চব্বিশ হাজার শ্লোক

সমন্বিত। রামায়ণে বৈদিক সমাজ ও সভ্যতার বিবরণ ছাড়াও লঙ্কার রাক্ষস-সভ্যতার বিবরণও আছে। রামায়ণের যুগে রাষ্ট্র ছিল রাজতান্ত্রিক। রাজার আদর্শ ছিল প্রজারঞ্জন। জাতিভেদ সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল। বহুবিবাহ ও স্বয়ম্বর-প্রথা এইযুগে প্রচলিত ছিল। ধর্মেকর্মে, যাগযজ্ঞে পশুবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। সমাজে পুরোহিতদের প্রবল আধিপত্য ছিল।

রামায়ণ

রামায়ণের ন্যায় মহাভারতে আর্য-অনার্য অথবা আর্য-আর্যেতর জাতির সংঘাত নাই। মহাভারতে এক অখণ্ড ভারতের নিদর্শন পাওয়া যায়। মহাভারতের যুগে আর্য-সভ্যতা প্রায় সমগ্র ভারতে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই মহাকাব্যে পারদ, যবন, বাহ্লিক প্রভৃতি বহির্ভারতীয় জাতির উল্লেখ আছে। মহাভারতের প্রধান নায়ক কৃষ্ণের বাসস্থান ছিল দ্বারকায়। মহাভারতের যুগে সমাজে বর্ণাশ্রম, বহু-বিবাহ ও স্বয়ংবর-প্রথা প্রচলিত ছিল। এই যুগে কিছু সামাজিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণের যুগে কোন শূদ্রের পক্ষে জপতপ বা বিদ্যাচর্চা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু মহাভারতের যুগে ইহার পরিবর্তন দেখা যায়। দাসীপুত্র বিদুর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সহচর ও মিত্র ছিলেন। পাণ্ডবদের খুল্লতাত শল্য ছিলেন অনার্য। এককথায় মহাভারতের যুগে বর্ণভেদ-প্রথার কঠোরতা কিছুটা হ্রাস পাইয়াছিল। মহাভারতের যুগে শিব ও বিষ্ণুর পূজা প্রসার লাভ করিয়াছিল।

মহাভারত

অনুশীলনী

১। আর্যরা কে ও কোথা হইতে ভারতে আসে ?

২। বেদ বলিতে কি বোঝায় ? বেদ কয়টি ও কি কি ?

৩। বৈদিক যুগে আর্যদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৪। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ—সূত্র-সাহিত্য, রামায়ণ ও মহাভারত।

৫। মহাকাব্যের যুগে ভারতের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ

বৈদিক যুগে ভারতীয় আর্যধর্ম ও সমাজ সহজ ও সুসংবদ্ধ ছিল। কিন্তু মহাকাব্যের যুগের শেষভাগ হইতে ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা জটিল হইয়া উঠে যাগ-যজ্ঞই পূজার প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠে। ফলে আর্য-সমাজে ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ক্ষমতাশালী ক্ষত্রিয়দের ক্ষোভের কারণ হইয়া উঠে। ইহার ফলে দেশে ধর্মবিপ্লব দেখা দেয়। এই ধর্মবিপ্লবের পুরোভাগে ছিলেন বর্ধমান বা মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ। উভয়েরই জন্ম হইয়াছিল ক্ষত্রিয়বংশে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে যে সকল নূতন ধর্মমতের উদ্ভব হইয়াছিল সেইগুলির মধ্যে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে।

মহাবীর ও তাঁহার শিক্ষা

জৈনধর্মের প্রবর্তক **বর্ধমান** বা **মহাবীর** উত্তর বিহারের বৈশালী নগরে এক ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গৌতম বুদ্ধ অপেক্ষা বয়সে কিছু বড় ছিলেন। মহাবীরের পিতা ছিলেন বৈশালীর এক সামন্ত-রাজা এবং মাতা ত্রিশলা ছিলেন রাজা বিম্বিসারের আত্মীয়া। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় সাড়ে পাঁচশত বৎসর পূর্বে মহাবীরের জন্ম হয়। জৈন কিংবদন্তী হইতে জানা যায়, রাজকুমার বর্ধমান তরুণ বয়সে যশোদা-নাম্নী এক কুমারীকে বিবাহ করেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে সংসারের সুখ-ভোগ ত্যাগ করিয়া মহাবীর সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। গোঁসাল নামে জনৈক গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তিনি বারো বৎসর কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন থাকেন। ইহার পর তিনি **কৈবল্য** বা পরম জ্ঞান লাভ করেন। তিনি **জিন** (অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়) ও **নির্গ্রন্থ** (বন্ধনমুক্ত) নামে পরিচিত হন। 'জিন' শব্দ হইতে **জৈন** শব্দের উৎপত্তি। তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মমত **জৈনধর্ম** নামে অভিহিত।

সিদ্ধিলাভের পর মহাবীর মগধ, বিদেহ, কোশল প্রভৃতি রাজ্যে তাঁহার নূতন ধর্মমত প্রচার করেন। বাহাত্তর বৎসর বয়সে পাবা নামক নগরে (বর্তমান পাটনা জেলায়) তিনি দেহত্যাগ করেন।

মহাবীরের শিক্ষা : জৈন ধর্মমত : মহাবীর তীর্থংকর পার্শ্বনাথ প্রচারিত ধর্মের সংস্কার করেন। পার্শ্বনাথ প্রচারিত **চতুর্যাম** আদর্শের সহিত মহাবীর আর একটি আদর্শ যোগ করেন, তাহা হইল **শুচিতা**। এই পাঁচটি আদর্শ একসঙ্গে **পঞ্চ মহাব্রত** নামে খ্যাত। ইহা ভিন্ন মহাবীর **সত্য-বিশ্বাস, সত্যজ্ঞান ও সত্য-আচরণ**—এই তিনটি সদ্‌-গুণের কথাও প্রচার করেন। এই তিন সত্যকে একত্রে **ত্রিরত্ন** বলা হয়। মহাবীর এই আদর্শ প্রচার করেন যে, পাপ-পুণ্য নিজের কর্ম অনুসারেই হইয়া থাকে এবং মানুষ সেই পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ করে।



মহাবীর

তিনি 'অহিংসা পরম ধর্ম' এই আদর্শ প্রচার করেন। হিন্দুদের ন্যায় জৈনগণ কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। জৈনদের মতে প্রত্যেক বস্তুরই প্রাণ বা জীবন আছে। জৈনদের জীবনযাত্রার মূলমন্ত্র হইল—**অহিংসা, সর্বজীবে দয়া এবং ইন্দ্রিয়জয়**।

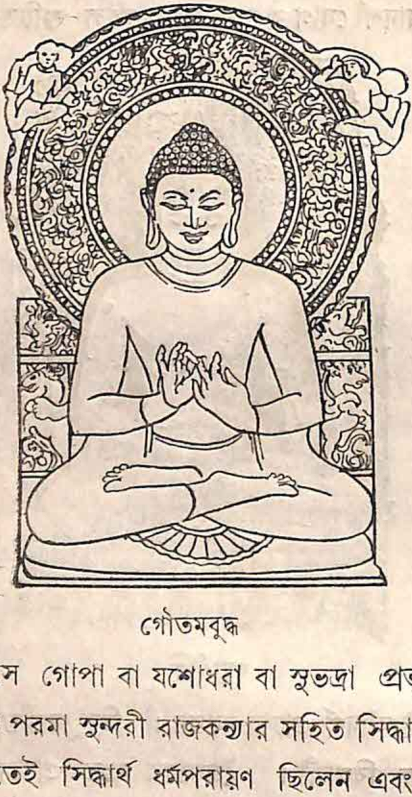
জৈন ধর্মগ্রন্থ : খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে পাটলিপুত্রে জৈনদের এক সম্মেলনে মহাবীরের উপদেশগুলি বারোটি খণ্ডে সংকলন করা হয়। ইহা **দ্বাদশ অঙ্গ** বা **সিদ্ধান্ত** নামে অভিহিত। এইগুলি প্রাকৃতভাষায় রচিত। **দ্বাদশ অঙ্গ** ছাড়াও জৈন ধর্মগ্রন্থগুলি **উপাঙ্গ, প্রকীর্ণ, ছেদসূত্র, মূলসূত্র** প্রভৃতি বিভিন্ন ভাগে সংকলিত হইয়াছিল।

গৌতমবুদ্ধ ও তাঁহার শিক্ষা

বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধের প্রকৃত নাম ছিল সিদ্ধার্থ বা গৌতম। তিনি হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নামক একটি রাজ্যের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬৭ অব্দে)।

প্রথম জীবন

লুম্বিনী উদ্যানে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা শুদ্ধোদন শাক্যজাতির নায়ক ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম ছিল মায়াদেবী। শাক্যগণ ছিল ক্ষত্রিয়। সিদ্ধার্থের জন্মের অল্পকালের মধ্যেই মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। তিনি বিমাতা ও মাতৃস্বসা প্রজাপতি গৌতমীর নিকট লালিত-পালিত হন। এই কারণে তাঁহার অপর নাম হয় গৌতম। তিনি কৈশোর ও যৌবনে ধনুর্বিদ্যা, মল্লযুদ্ধ ও নানা শিল্পকলায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ষোল বৎসর বয়সে গোপা বা যশোধরা বা সুভদ্রা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিতা এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যার সহিত সিদ্ধার্থের বিবাহ হয়। বাল্যকাল হইতেই সিদ্ধার্থ ধর্মপরায়ণ ছিলেন এবং সংসারের ভোগ-বিলাসের প্রতি ছিলেন উদাসীন। জীবনের দুঃখ-কষ্ট, জরা, মৃত্যু তাঁহার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার করে। তিনি উন্নত জীবনপথের সন্ধান পাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠেন। এমন সময় ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে রাহুল নামে তাঁহার এক পুত্র-সন্তান জন্মলাভ করে। সংসারের বন্ধন ক্রমেই বাড়িতেছে দেখিয়া একদিন স্ত্রী, পুত্র ও রাজপ্রাসাদের ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধার্থ সত্য ও জ্ঞানের সন্ধানে বাহির হন। এই ঘটনা বৌদ্ধ ইতিহাসে **মহাভিনিষ্ক্রমণ** নামে খ্যাত।



গৌতমবুদ্ধ

গৃহত্যাগ করার পর সিদ্ধার্থ কিছুদিন বৈশালী ও রাজগৃহে বিখ্যাত জ্ঞানী অলড়কসাল ও পণ্ডিত রুদ্রকের নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিন্তু তাঁহার আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবারিত হইল না। ইহার পর তিনি বুদ্ধগয়ার নিকটে উরুবিল্ব নামক স্থানে কঠোর আত্মপীড়ন ও কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী হন। কিন্তু তথাপি তিনি প্রকৃত শান্তি ও সত্যের সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে তিনি গয়ার নিকটে নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান করিয়া একটি অশত্থবৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন হইলেন। এই স্থানেই সিদ্ধার্থ **বোধি** বা দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। ইহার পর তিনি **বুদ্ধ** (পরম জ্ঞানী) ও **তথাগত** (যিনি সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন) নামে পরিচিত হন।

বুদ্ধত্ব লাভ

কিন্তু নিজে পরমজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি তৃপ্তি পাইলেন না। সকল মানুষ যাহাতে এই জ্ঞান লাভ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি কাশীর নিকটে সারনাথে মৃগদাব বা মৃগবনে তাঁহার প্রিয় পাঁচজন শিষ্যকে প্রথম উপদেশ প্রদান করেন। ইহা **ধর্মচক্র-প্রবর্তন** নামে খ্যাত। ইহার পর তিনি মগধ, কোশল প্রভৃতি রাজ্যে পরিভ্রমণ করিয়া ধর্মপ্রচার করিতে থাকেন। বুদ্ধ কপিলাবস্তুতে ফিরিয়া আসিয়া পুত্র রাহুল ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দকে নূতন ধর্মে দীক্ষিত করেন। শ্রাবস্তীর বিখ্যাত বণিক সুদত্ত শ্রাবস্তীর জেতবনটি বুদ্ধকে উপহার দেন। বুদ্ধের প্রধান শিষ্যগণ—মহাকাশ্যপ, আনন্দ, সারিপুত্ত, মোগ্গলান ও উপালি বুদ্ধের বাণী সর্বত্র জনপ্রিয় করিয়া তোলেন। এইভাবে ধর্মপ্রচার করিয়া ৮০ বৎসর বয়সে গোরখপুর জেলার অন্তর্গত কুশীনগরে বুদ্ধ দেহত্যাগ করেন। ইহা **পরিনির্বাণ** নামে খ্যাত।

ধর্ম-প্রচার

বৌদ্ধ ধর্মমত ঃ অতি সহজ ও সরল ভাষায় বুদ্ধদেব তাঁহার বাণী বা ধর্মমত প্রচার করেন। সংসারের দুঃখ-কষ্ট হইতে মানুষ যাহাতে মুক্তি পায়, তাহাই ছিল বুদ্ধদেবের একমাত্র কামনা। তিনি মনে করিতেন, অত্যধিক আত্মপীড়ন ও কৃচ্ছ্রসাধন অথবা অত্যধিক ভোগবিলাস উন্নত জীবনলাভের অন্তরায়। এই কারণে তিনি মানুষকে

মধ্যপন্থা বা মধ্যপথের নির্দেশ দিয়াছেন। নির্বাণলাভের উপায় হিসাবে তিনি **অষ্টপন্থা** বা **অষ্টমার্গের** নির্দেশ দিয়াছেন। এই অষ্টপন্থা বলিতে বুঝায়—সৎ সংকল্প, সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য, সৎ ব্যবহার, সৎ জীবন-যাপন, সৎ প্রচেষ্টা, সৎ দৃষ্টি ও সম্যক সমাধি। বুদ্ধের ধর্মমতের মূল কথাই হইল—সত্য, প্রেম ও অহিংসা।

বুদ্ধের নির্বাণের কিছুদিন পরে তাঁহার শিষ্যগণ রাজগৃহে মিলিত হইয়া বুদ্ধের বাণী ও উপদেশাবলী (**সূত্র-পিটক**), সংঘ পরিচালনার নিয়মাবলী (**বিনয়-পিটক**) সংকলন করেন। সম্রাট অশোকের সময় **অভিধর্ম-পিটক** (বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক তত্ত্বসমূহ) রচিত হয়। পালিভাষায় রচিত এই তিনটি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের নাম **ত্রিপিটক**। ইহা ছাড়া **জাতক** গ্রন্থটিও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদির অন্তর্ভুক্ত।

অনুশীলনী

১। মহাবীর কে ছিলেন ? তাঁহার জীবনকথা বল।

২। জৈন ধর্মের মূলনীতিগুলি আলোচনা কর।

৩। জৈন ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে একটি টীকা লিখ।

৪। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক কে ছিলেন ? তাঁহার জীবনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৫। বুদ্ধদেবের শিক্ষা সরলভাবে বল।

৬। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে একটি টীকা লিখ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভারত-ইতিহাসের ধারা

ভূমিকা ঃ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায়ের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সময় হইতে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যে ভারতে একাধিক রাজবংশের উত্থান ঘটে এবং সেই সঙ্গে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য গঠনের প্রচেষ্টা চলে।

মগধ সাম্রাজ্য

মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের যুগে ভারতে ষোলটি **মহাজনপদ** বা রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ষোলটি রাজ্য কাবুল উপত্যকা হইতে দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রাজ্যগুলির মধ্যে কোশল (অযোধ্যা), অবন্তী (মালব), বৎস (এলাহাবাদ) ও মগধ (দক্ষিণ বিহার) সর্বাধিক শক্তিশালী হইয়া উঠে। ভারতে একাধিপত্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই চারিটি রাজ্যের



নৃপতিগণ পরস্পরের সহিত অবিরত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন। অবশেষে প্রতিদ্বন্দ্বী তিনটি রাজ্যের ধ্বংসসাধন করিয়া মগধরাজ বিম্বিসার আর্যাবর্তে সার্বভৌম রাজশক্তি স্থাপন করেন। মগধে যথাক্রমে চারিটি

প্রসিদ্ধ রাজবংশ রাজত্ব করে ; যথা—হর্যঙ্কবংশ, শৈশুনাগ বংশ, নন্দবংশ ও মৌর্যবংশ।

হর্যঙ্কবংশ

হর্যঙ্ক বংশীয় রাজগণের মধ্যে বিম্বিসার ও অজাতশত্রু বিখ্যাত। গৌতম বুদ্ধের সময় বিম্বিসার মগধের রাজা ছিলেন। পনেরো বৎসর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল রাজগৃহ। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী অঙ্গরাজ্যের রাজা ব্রহ্মদত্তকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য দখল করেন।

বিম্বিসার

ইহার পর তিনি মদ্র (মধ্য পাঞ্জাব), কোশল ও বৈশালীর লিচ্ছবীদের সহিত বৈবাহিক-সূত্রে আবদ্ধ হন। কোশল রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া বিম্বিসার যৌতুক হিসাবে কাশীরাজ্যটি লাভ করেন। বিম্বিসার শুধু রাজ্যজয় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি রাজ্যের উপযুক্ত শাসন ব্যবস্থারও প্রবর্তন করিয়াছিলেন। বিম্বিসার জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কথিত আছে, বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু পিতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন। স্বামীর শোকে রাজমহিষী কোশলদেবী (কোশল রাজকন্যা এবং প্রসেনজিৎ-এর ভগিনী) প্রাণত্যাগ করেন।

অজাতশত্রু ঃ অজাতশত্রু মগধের সিংহাসন দখল করিলে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। অপর দিকে বৈশালীর বৃজি এবং পাবা ও কুশীনগরের মল্লগণও তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কোশল ও মগধের মধ্যে কিছুদিন যুদ্ধ চলিবার পর প্রসেনজিৎ পরাজিত হন। সন্ধির শর্ত অনুসারে অজাতশত্রু প্রসেনজিৎ-এর কন্যাকে বিবাহ করেন এবং যৌতুক হিসাবে কাশী রাজ্যটি লাভ করেন। ষোল বৎসর যুদ্ধ চলিবার পর অজাতশত্রু বৃজি ও মল্লদের পরাজিত করেন। ইহার ফলে মগধ আর্যাবর্তের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্যে পরিণত হয়।

পুরাণ অনুযায়ী অজাতশত্রুর পর তাঁহার পুত্র ও পৌত্র যথাক্রমে দারাশোক ও উদয়িন মগধে রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ রাজা

নাগদাসকে হত্যা করিয়া মন্ত্রী শিশুনাগ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

শৈশুনাগ বংশ : খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের শেষভাগে শিশুনাগ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া শৈশুনাগ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। শৈশুনাগ বংশের নৃপতিগণ কোশল, বৎস ও অবন্তী রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। এই বংশের শেষ রাজাকে হত্যা করিয়া মহাপদ্ম উগ্রসেন নামক জনৈক শূদ্র মতান্তরে ক্ষত্রিয় বীর মগধের সিংহাসন দখল করেন।

নন্দবংশ : মহাপদ্মনন্দ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নন্দবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। বিজেতা ও শাসক হিসাবে মহাপদ্ম অসামান্য যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি ইক্ষ্বাকু, পাঞ্চাল, কুরু, মিথিলা প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। বস্তুতঃ মহাপদ্মকেই ভারতে প্রথম সাম্রাজ্যের স্রষ্টা বলা যাইতে পারে।



আলেকজাণ্ডার

এই বংশের শেষ রাজা ধননন্দের রাজত্বকালে ম্যাসিডন-রাজ আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তক্ষশীলার চাণক্য নামে এক ব্রাহ্মণের সাহায্যে ও বুদ্ধিবলে মগধের সিংহাসন দখল করিলে নন্দবংশের অবসান ঘটে।

মৌর্যবংশ : মৌর্যবংশের রাজত্বকাল (খ্রীষ্টপূর্ব ৩২১-১৮৫) ভারতের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইহা এক গৌরবময় যুগ। মৌর্যরাজগণ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে একত্রিত করিয়া একটি বিশাল অখণ্ড রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই রাজবংশের আমলেই বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মরূপে স্বীকৃতি লাভ করে।

মৌর্যযুগের গুরুত্ব

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ঃ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা। মগধে তাঁহার বাল্যকাল ও কৈশোর অতিবাহিত হয়। মগধে সেই সময় নন্দরাজগণের কুশাসনের বিরুদ্ধে প্রজাবর্গ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। এই অবস্থায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশের ধ্বংস সাধনের নিমিত্ত গ্রীকদের সাহায্যলাভের আশায় আলেকজাণ্ডারের শিবিরে উপস্থিত হন। কিন্তু তাঁহার উদ্ধত ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া আলেকজাণ্ডার চন্দ্রগুপ্তের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। চন্দ্রগুপ্ত কোনক্রমে গ্রীক শিবির হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। ইহার পর চাণক্য নামে তক্ষশীলার জনৈক সুচতুর ব্রাহ্মণের সহিত চন্দ্রগুপ্তের পরিচয় হয়। চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে বীরত্বের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রাজনীতি ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তোলেন। অবশেষে চাণক্যের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পাটলিপুত্র আক্রমণ করেন। নন্দবংশের শেষরাজাকে পরাজিত করিয়া তিনি মগধের সিংহাসন দখল করেন।

মগধের সিংহাসন দখল

মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই চন্দ্রগুপ্ত উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে গ্রীকগণকে উচ্ছেদ করিতে উদ্যোগী হন। কয়েকটি যুদ্ধে তিনি গ্রীকগণকে পরাজিত করেন এবং পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশকে গ্রীক অধীনতা হইতে মুক্ত করেন। ইহার পর চন্দ্রগুপ্ত মালব, সৌরাষ্ট্র ও মহীশূরের কিছু অংশ মৌর্যসাম্রাজ্যভুক্ত করেন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতি সেলিউকস ভারতে গ্রীক অধিকৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি অকৃতকার্য হইয়া চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধি করেন। মিত্রতার নিদর্শন স্বরূপ সেলিউকস মেগাস্থিনিস নামক এক দূতকে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় প্রেরণ করেন। বিভিন্ন রাজ্য জয় করার ফলে চন্দ্রগুপ্তের সময় মগধসাম্রাজ্য পূর্বে বঙ্গদেশ হইতে পশ্চিমে আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিংবদন্তী অনুসারে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য জৈনরীতি অনুসারে অনশনে প্রাণত্যাগ করেন।

গ্রীক বিতাড়ন ও রাজ্য জয়

বিন্দুসার (খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০-২৭৩) : চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার **'অমিত্রাঘাত'** (শত্রুনিধনকারী) উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। চাণক্য কিছুকাল বিন্দুসারের মন্ত্রী ছিলেন। বিন্দুসার গ্রীকদের সহিত সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে তক্ষশীলায় এক বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল। যুবরাজ অশোক তাহা দমন করেন। বিন্দুসার শান্তিকামী ও শিক্ষার প্রতি অনুরাগী ছিলেন।

অশোক (খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৩-২৩২) : বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অশোকবর্ধন বা অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার রাজত্বকালে অশোক উজ্জয়িনী ও তক্ষশীলার শাসনকর্তা ছিলেন। অশোক প্রথম জীবনে আমোদ-প্রমোদ, মৃগয়া ও যুদ্ধ-বিগ্রহাদি পছন্দ করিতেন। অভিষেকের প্রায় নয় বৎসর পরে অশোক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ কলিঙ্গ রাজ্য (উড়িষ্যা) আক্রমণ করেন। মৌর্যদের সহিত কলিঙ্গবাসী বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াও অবশেষে পরাজিত হয়। কলিঙ্গরাজ্য মৌর্যসাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এই যুদ্ধে প্রায় দেড় লক্ষ কলিঙ্গবাসী নিহত হয়। কলিঙ্গ-যুদ্ধ অশোকের জীবনে তথা বিশ্বের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। যুদ্ধের মর্মান্তিক দৃশ্য ও আর্তের দুঃখ অশোককে শোকতপ্ত ও অনুতপ্ত করে। ইহার পর তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং দিগ্বিজয়-নীতি পরিত্যাগ করিয়া



অশোক

কলিঙ্গজয় ও ফলাফল

ধর্মবিজয়-নীতি গ্রহণ করেন। তিনি অহিংসা, মৈত্রী ও ধর্মপ্রচার দ্বারা মানুষের হৃদয় জয় করিবার আদর্শ গ্রহণ করেন।

অশোকের ধর্মনীতির সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ নীতিরও পরিবর্তন ঘটে। জনসাধারণের তথা জীবমাত্রেরই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতি সাধন করাই তাঁহার জীবনের ব্রত হয়। তিনি **ধর্মমহামাত্র** নামে একদল রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেন। ইহাদের দায়িত্ব ছিল ধর্মপ্রচার করা, ব্রাহ্মণ, যবন ও জৈনগণকে রক্ষা করা এবং বিচারকার্য পরিচালনা করা। অশোক দরিদ্রের জন্য ভিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। জনসাধারণের উপকারের জন্য তিনি প্রশস্ত রাজপথ, অতিথিশালা ও পশুর জন্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি নির্মাণ করান।

শাসননীতির পরিবর্তন ও ধর্ম-প্রচার

অশোকের বৌদ্ধধর্ম-প্রচার তাঁহাকে বিশ্বের ইতিহাসে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। তিনি ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশে ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়া অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করেন। তাঁহারই চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মে পরিণত হইয়াছিল। মানবহিতৈষী রূপে তাঁহার কীর্তি চিরস্মরণীয়।

অশোকের কৃতিত্ব

মৌর্যসাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ঃ বিশাল মৌর্যসাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ছিল উন্নত। রাষ্ট্রের মূল আদর্শ ছিল জনকল্যাণ ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধন করা। সম্রাট ছিলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ছিলেন একাধারে প্রধান বিচারপতি, প্রধান সেনাপতি ও প্রধান আইন-রচয়িতা। সম্রাটকে সাহায্য করার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ ছিল। গ্রামাঞ্চলেও নগরের শাসনভার **অধ্যক্ষ** নামে এক শ্রেণীর কর্মচারীদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য এক বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল।

মৌর্যসাম্রাজ্যের পতন ঃ সম্রাট অশোকের মৃত্যুর অনতিকাল মধ্যে মৌর্যসাম্রাজ্যের পতন হয়। অনেকের মতে অশোকের পরবর্তী সম্রাটদের অযোগ্যতা, কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা প্রভৃতি কারণে সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। আবার অনেকে মনে করেন অশোকের অহিংসা-নীতি, যুদ্ধ-নীতির পরিবর্তে ধর্মবিজয়-নীতি গ্রহণ প্রভৃতি

কারণে সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি ক্ষুণ্ণ হয়। ইহার ফলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয় এবং বৈদেশিক আক্রমণ সাম্রাজ্যকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়।

কুষাণসাম্রাজ্য ও কণিষ্ক : সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্যসাম্রাজ্য ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতে থাকে। সেই সুযোগে ভারতের অভ্যন্তরে যেরূপ নূতন নূতন স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়, তেমনি একাধিক বৈদেশিক জাতিগুলিও ভারত আক্রমণ করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে উহাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। এই বৈদেশিক জাতিগুলির মধ্যে কুষাণগণ ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

কুষাণদের সর্বপ্রথম শক্তিশালী রাজা ছিলেন **কুজুল কদ্‌ফিসেস**। তিনি পহ্লবগণকে পরাজিত করিয়া কাবুল ও কান্দাহার জয় করেন। কুজুল কদ্‌ফিসেসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় কদ্‌ফিসেস কুষাণ সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের কিছু অংশ দখল করিয়া তিনি ভারতে কুষাণ সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি গ্রীক মুদ্রার অনুকরণে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন। তিনি সম্ভবতঃ শৈবধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন।

কুষাণদের প্রথম দুই রাজা

কণিষ্ক : দ্বিতীয় কদ্‌ফিসেসের পর কণিষ্ক কুষাণ সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। তিনি ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই কণিষ্ক একটি সম্বৎ প্রচলন করেন। কণিষ্ক কর্তৃক প্রবর্তিত সম্বৎকে 'শকাব্দ' বলা হইয়া থাকে।

কণিষ্ক ছিলেন বীর যোদ্ধা ও দিগ্বিজয়ী সম্রাট। তিনি বহু রাজ্য জয় করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলেন। কাশ্মীর, কাবুল, পাঞ্জাব, মালব, রাজপুতানা ও উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশ কণিষ্কের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তিনি তুর্কীস্তানের অন্তর্গত কাশগড়, খোটান ও ইয়ারখন্দ জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য মধ্য-এশিয়া হইতে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশোয়ার।

রাজ্যজয়

বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি পেশোয়ারে একটি বিশাল বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন। কণিষ্কের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম মধ্য-এশিয়া ও চীনে প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি অপর ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

কণিষ্কের ধর্ম

কণিষ্ক শিল্প-সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আমলে মথুরা একটি সুসজ্জিত নগরে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে গান্ধার-শিল্প চরম উৎকর্ষ লাভ করে। ইহা গ্রীক ও রোমান শিল্পের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। কণিষ্কের রাজসভায় বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত বিরাজ করিতেন। ইহাদের মধ্যে বুদ্ধ-চরিত গ্রন্থের রচয়িতা অশ্বঘোষ, বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের রচয়িতা চরক-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।


কণিষ্ক

কণিষ্কের পর বশিষ্ক, হুবিষ্ক ও প্রথম বাসুদেব রাজত্ব করেন। ভারতে গুপ্তরাজবংশের উত্থানের ফলে ক্রমে ক্রমে কুষাণসাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

গুপ্তসাম্রাজ্য : মৌর্যসাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়। কুষাণগণ ভারতের কিছু অংশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মগধে পুনরায় গুপ্ত রাজবংশের নেতৃত্বে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে। গুপ্তরাজগণ শক, কুষাণ প্রভৃতি বৈদেশিক রাজবংশকে ভারত হইতে বিতাড়িত করেন, দেশে

ভারতে গৌরবময় যুগের সূচনা

শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনেন এবং তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় ধর্ম, সাহিত্য বিজ্ঞান ও শিল্পকলার অপূর্ব বিকাশ ঘটে।

গুপ্তবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। অনেকের মতে গুপ্তসম্রাটদের পূর্বপুরুষ কুষাণরাজগণের অধীনে কর্মচারী ছিলেন।

গুপ্তবংশের উৎপত্তি

সমসাময়িক লিপি হইতে জানা যায় যে, মগধের সন্নিকটে শ্রীগুপ্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ তিনি ও তাঁহার পুত্র ঘটোৎকচ মগধের এক ক্ষুদ্র অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩২০-৩৩০ খ্রীঃ) ঃ গুপ্তবংশের প্রথম সার্বভৌম রাজা ছিলেন ঘটোৎকচ-এর পুত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। তিনি **'মহারাজাধিরাজ'** উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি লিচ্ছবী রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবী রাজ্যটিকে দখল করিয়া সমগ্র বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও বাংলার কিছু অংশে আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহার রাজ্যসীমা মগধ হইতে অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র।

সমুদ্রগুপ্ত (৩৩০-৩৮০ খ্রীঃ) প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সমুদ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন গুপ্তবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ও প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ন্যায় সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি আর্যাবর্তের নৃপতি রুদ্রদেব, চন্দ্রবর্মা, নাগদেব প্রভৃতিকে পরাজিত করিয়া আর্যাবর্তে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর তিনি দাক্ষিণাত্য বিজয়ে অগ্রসর হন। দক্ষিণ ভারতের নৃপতিগণ মহেন্দ্র, ব্যাঘ্ররাজ, হস্তিবর্মা, বিষ্ণুগোপ প্রভৃতি সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করেন পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মালব, বাংলা, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলের নৃপতিগণও

সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়

সমুদ্রগুপ্তের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া কর-প্রদানে স্বীকৃত হন। এমনকি ভারতের কুষাণ ও উত্তর-পশ্চিম গুজরাটের শকরাজগণও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। দিগ্বিজয় সম্পন্ন করিয়া সমুদ্রগুপ্ত এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

সমুদ্রগুপ্তের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তিনি একাধারে ছিলেন বীর যোদ্ধা, সংগীতজ্ঞ, সুকবি ও বিদ্যোৎসাহী। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু অপর ধর্মের প্রতিও তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। কাব্য-প্রতিভার জন্য তিনি **কবিরাজ** উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। খ্যাতনামা বৌদ্ধ লেখক বসুবন্ধু ও সভাকবি হরিষেণ তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের চরিত্র ও কৃতিত্ব

সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন ভারতের সনাতন দিগ্বিজয়ী আদর্শের মূর্ত প্রতীক। উত্তর ভারতে দিগ্বিজয় নীতি ও দক্ষিণ ভারতে মিত্রতামূলক নীতি গ্রহণ করিয়া তিনি কূটনীতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি বৈদেশিক প্রভাব হইতে তাঁহার শাসনব্যবস্থাকে মুক্ত করিয়া প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (৩৮০-৪১৫ খ্রীঃ) ঃ সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার অন্যতম পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিভিন্ন নামে তিনি পরিচিত ছিলেন; যথা—বিক্রমাদিত্য, নরেন্দ্রচন্দ্র, দেবশ্রী ইত্যাদি। তাঁহার মাতার নাম ছিল দত্তাদেবী। তাঁহার দুই মহিষীর নাম ছিল ধ্রুবদেবী ও কুবেরনাগ। পিতার ন্যায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পরাক্রান্ত শাসক ও সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন নরপতি ছিলেন। তিনি মধ্য ভারতের পরাক্রান্ত নাগবংশের রাজকন্যা কুবেরনাগকে বিবাহ করেন, এবং নিজের কন্যা প্রভাবতীকে বিদর্ভের বাকাটক-রাজ দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সহিত বিবাহ দেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সর্বাধিক সামরিক কৃতিত্ব হইল সৌরাষ্ট্র দখল করিয়া আরবসাগর পর্যন্ত গুপ্তসাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান। তিনি পশ্চিম ভারতের শাক্যরাজগণকে পরাস্ত করিয়া মালব ও সৌরাষ্ট্র দখল করেন। এই সাফল্যের জন্য তিনি **শকারি** নামে পরিচিত হন। পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলি গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত আফগানিস্তানের কুষাণদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাজ্যজয়

পিতার ন্যায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিদ্যোৎসাহী ও শিল্পানুরাগী নরপতি ছিলেন। প্রাচীন লিপিতে তাঁহাকে 'সূর্যের মত বিক্রমশালী' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি সাহিত্যের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

কিংবদন্তী আছে যে একই সময় কালিদাস, বরাহমিহির, ববরুচি, ঘটকর্পর, বেতালভট্ট, ধন্বন্তরি, অমরসিংহ এবং শঙ্কু নামে ভারতের নয়জন মনীষী তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতে আসিয়াছিলেন। ফা-হিয়েন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থার প্রশংসা করিয়াছেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালেই গুপ্তসাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখরে উঠিয়াছিল। তিনি ভারত হইতে বৈদেশিক শাসনের অবসান ঘটাইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি ছিল **পরমভাগবত**। তিনি বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

পরবর্তী গুপ্তরাজগণঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রথম কুমার গুপ্ত **মহেন্দ্রাদিত্য** উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন (৪১৫ খ্রীঃ)। তিনি গুপ্তসাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় কুমারগুপ্তও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

প্রথম কুমার গুপ্ত

প্রথম কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র স্কন্দগুপ্ত **বিক্রমাদিত্য** উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন গুপ্তবংশের শেষ শক্তিশালী রাজা। তাঁহার পিতার রাজত্বকালেই তিনি সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে হূণ আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। স্কন্দ-গুপ্তের সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে হূণগণ পুনরায় গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ করে। কিন্তু স্কন্দগুপ্ত বুদ্ধি ও বাহুবলে সেই আক্রমণ পুনরায় ব্যর্থ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে গুপ্ত সাম্রাজ্য বাংলা হইতে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

স্কন্দগুপ্ত
(৪৫৫-৪৬৭ খ্রীঃ)

গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনঃ স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর হইতে গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। হূণদের প্রবল আক্রমণে গুপ্তসাম্রাজ্য

খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া পড়ে। পুষ্যমিত্র নামক অপর এক দুর্ধর্ষ জাতির আক্রমণে গুপ্তরাজশক্তির পতন ঘটে। বৈদেশিক আক্রমণ ও গুপ্তরাজগণের দুর্বলতার সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

কনৌজ সাম্রাজ্য ঃ পুষ্যভূতি বংশ ঃ গুপ্তবংশের পর থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠনে প্রয়াসী হইয়াছিল।

পুষ্যভূতি বংশের প্রথম দুই রাজা

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে পূর্ব পাঞ্জাবে বৈশ্যজাতীয় পুষ্যভূতি বংশের অভ্যুদয় ঘটে। এই বংশের রাজধানী ছিল থানেশ্বর। প্রভাকরবর্ধন ছিলেন এই বংশের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য নরপতি। তিনি হূণ, গুর্জর প্রভৃতি বৈদেশিক আক্রমণকারীগণকে পরাস্ত করিয়া মালব ও গুজরাট পর্যন্ত নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করেন। তিনি কনৌজের অধিপতি গ্রহবর্মার সহিত স্বীয় কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দিয়াছিলেন। ইহার ফলে পুষ্যভূতি বংশের সহিত কনৌজের মৌখরী বংশের মিত্রতা স্থাপিত হয়।

৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজ্যবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মালবের রাজা দেবগুপ্তকে পরাজিত ও নিহত করেন। এই যুদ্ধে গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক দেবগুপ্তের মিত্র হিসাবে গ্রহবর্মাকে নিহত করেন এবং তাঁহার মহিষী রাজ্যশ্রীকে বন্দী করেন। রাজ্যবর্ধন কনৌজের দিকে অগ্রসর হন; কিন্তু শশাঙ্কের হস্তে তিনি পরাজিত হইয়া বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু হয়।

হর্ষবর্ধন ঃ ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু হইলে হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিমধ্যে কনৌজের রাজা গ্রহবর্মার মৃত্যু হইলে কনৌজের অমাত্যগণের আমন্ত্রণে হর্ষবর্ধন কনৌজের শাসনভারও স্বহস্তে গ্রহণ করেন। হর্ষবর্ধন থানেশ্বর ও কনৌজের রাজ্য দুইটিকে সম্মিলিত করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই হর্ষবর্ধনের প্রথম কাজ হইল ভগিনী

রাজ্যশ্রীকে শশাঙ্কের হস্ত হইতে উদ্ধার করা। বহু অনুসন্ধানের পর হর্ষবর্ধন বিন্ধ্যপর্বতের অরণ্যে রাজ্যশ্রীর সন্ধান পাইলেন। তিনি রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করিয়া কনৌজে ফিরিয়া আসেন। হর্ষবর্ধন কনৌজের ইতিহাসে **শিলাদিত্য** নামে পরিচিত। হর্ষবর্ধনের নূতন রাজধানী হয় কনৌজ।

রাজ্যশ্রীর উদ্ধার

হর্ষবর্ধন ছিলেন সেযুগের এক পরাক্রান্ত নরপতি। রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করিয়া হর্ষবর্ধন সর্বপ্রথম শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি শশাঙ্কের ক্ষতিসাধন করিতে পারেন নাই। ইহার পর হর্ষবর্ধন উত্তরবঙ্গে অভিযান শুরু করেন। ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলা দখল করেন। পশ্চিমে তিনি সৌরাষ্ট্রের বলভী রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় ধ্রুবসেনকে পরাস্ত করেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট তিনি পরাজিত হন। থানেশ্বর ও কনৌজ ছাড়া পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

রাজ্যজয়



হর্ষবর্ধন

হর্ষবর্ধন ছিলেন প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ, বিদ্যানুরাগী ও প্রজাহিতৈষী নরপতি। তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ। প্রজাদের সুখ-সুবিধার জন্য তিনি রাজ্যের সর্বত্র সরাইখানা, বিশ্রামাগার, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি বহু জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নাট্যকার ও কবি হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'নাগনন্দা,' 'রত্নাবলী' ও 'প্রিয়দর্শিকা' সুধীসমাজে আদৃত হইয়াছিল। 'হর্ষচরিত'-রচয়িতা বাণভট্ট হর্ষের সভাকবি ছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং লিখিয়াছেন যে হর্ষবর্ধন রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ সাহিত্যসেবীদের

হর্ষবর্ধনের চরিত্র ও কৃতিত্ব

জন্য ব্যয় করিতেন। বুদ্ধের অনুরাগী হইলেও হর্ষ ছিলেন শিবের উপাসক। তিনি প্রতিদিন এক হাজার বৌদ্ধভিক্ষুর সহিত পাঁচশত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন।

প্রতিহার বংশ :—গুর্জর-প্রতিহারগণ ছিল হূণজাতির একটি শাখা। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে ইহারা ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। কালক্রমে ইহারা ভারতীয় সমাজে মিশিয়া যায় এবং 'ক্ষত্রিয়' নামে পরিচিত হয়। প্রথম নাগভট্ট (৭২৫-৪০ খ্রীঃ) ছিলেন এই বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা। তিনি মালবে প্রতিহার বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। উজ্জয়িনী ছিল তাঁহার রাজধানী। এই বংশের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন বৎসরাজ (৭৭৮-৮০০ খ্রীঃ)। বৎসরাজ বাংলার পালবংশের রাজা ধর্মপালকে পরাজিত করেন। কিন্তু তিনি নিজেই দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট বংশের রাজা ধ্রুবের নিকট পরাজিত হন। বৎসরাজের পর দ্বিতীয় নাগভট্ট (৮০৫-২৫ খ্রীঃ) প্রতিহার বংশের গৌরব কিছুটা পুনরুদ্ধার করেন। তাঁহার সময় হইতে উত্তর ভারতের প্রাধান্য লইয়া প্রতিহার, পাল ও রাষ্ট্রকূট বংশের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। দ্বিতীয় নাগভট্টের পৌত্র প্রথম ভোজ বাংলার পালরাজগণের দুর্বলতা ও রাষ্ট্রকূট রাজ্যে বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া উত্তর ভারতে প্রতিহারবংশের প্রাধান্য পুনরায় স্থাপন করেন। তিনি উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব-পাঞ্জাব পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। প্রথম ভোজের পর তাঁহার পুত্র প্রথম মহেন্দ্রপাল (৮৮৫-৯১০ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রতিহার সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করিতে সমর্থ হন। তাঁহার আমলে প্রতিহার সাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখরে উঠিয়াছিল। তিনি বাংলার পালবংশীয় রাজা নারায়ণপালকে পরাজিত করিয়া মগধ অধিকার করেন। প্রথম মহেন্দ্রপাল শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কবি রাজশেখর মহেন্দ্রপালের সভাকবি ছিলেন।

বাংলার গৌড়সাম্রাজ্য : ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বঙ্গদেশেও শক্তিশালী রাষ্ট্রের উদ্ভব একই সময় হইয়াছিল। উত্তর

ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রতিযোগিতায় বাংলার নৃপতিগণও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শশাঙ্ক ঃ গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের সময় হইতেই বাংলায় প্রকৃত রাজশক্তি ও সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা শুরু হয়। বাংলার রাজাদের মধ্যে শশাঙ্ককেই সর্বপ্রথম সার্বভৌম রাজা বলা যায়। তাঁহার বংশপরিচয় অজ্ঞাত। অনেকের মতে তিনি মগধ ও গৌড়ের অধিপতি মহাসেনগুপ্তের অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন। গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের সময় 'গুপ্ত' উপাধিধারী রাজগণ উত্তরবঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। এই সময় বাংলার এই অঞ্চল গৌড় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। গুপ্তরাজগণের দুর্বলতার সুযোগে ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই শশাঙ্ক নামে জনৈক সামন্ত এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণ। নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াই শশাঙ্ক রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হন। ইহার ফলে উত্তর ভারতের অন্যান্য উদীয়মান রাজবংশগুলির সহিত তাঁহার যুদ্ধ-বিগ্রহের সূত্রপাত হয়।

শশাঙ্ক রাজা হইয়াই রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হন। প্রথমে তিনি বাংলা ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার করেন। তিনি দক্ষিণে দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর জেলা), উৎকল (উড়িষ্যা) ও কোঙ্গদ রাজ্য (গঞ্জাম জেলা) জয় করেন। পশ্চিমে তিনি মগধ জয় করেন। এইভাবে অল্প সময়ের মধ্যে শশাঙ্ক এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলেন। ইহার পর তিনি কনৌজরাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন।

রাজ্যবিস্তার

তিনি কনৌজের রাজা গ্রহবর্মাকে নিহত করিয়া তাঁহার মহিষী রাজ্যশ্রীকে বন্দী করেন। থানেশ্বরের রাজা রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি শশাঙ্কের হস্তে পরাজিত হইয়া বন্দী হন। বন্দী-অবস্থায় রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু হয়। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করিয়া কনৌজের দিকে অগ্রসর হন। শশাঙ্ক কনৌজ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের কোন ক্ষতিসাধন করিতে

পারেন নাই। ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শশাঙ্ক স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করেন। শশাঙ্ক ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার রাজধানী কর্ণসুবর্ণে বৌদ্ধদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। শশাঙ্ক ছিলেন শিবের উপাসক।

বাংলার পালসাম্রাজ্য : পালবংশ : গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশে দারুণ অরাজকতা চলিতে থাকে। কোন রাজা না থাকায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ ও ধনী বণিকগণ নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠেন। দুর্বল সবলের উপর উৎপীড়ন করিতে থাকে। সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ পরিস্থিতিকে 'মাৎস্যন্যায়' বলা হয়।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর অরাজকতা

বঙ্গদেশের এই অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করার অভিপ্রায়ে বাংলার প্রধান নেতাগণ বপ্যটের পুত্র গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে রাজপদে নির্বাচিত করেন। দেশের জনসাধারণও তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। এই ভাবে বাংলায় পালবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। গোপালের সুশাসনে বাংলায় পুনরায় শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসে।

পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল

ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খ্রীঃ) : গোপালের পুত্র ধর্মপাল ছিলেন পালবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি ক্ষুদ্র পালরাজ্যকে সাম্রাজ্যের মর্যাদায় উন্নীত করেন। সমগ্র আর্যাবর্তে এক সার্বভৌম রাজশক্তি স্থাপন করাই ছিল তাঁহার জীবনের স্বপ্ন। সেই সময় উত্তর ভারতের প্রভুত্ব লইয়া প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট বংশের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতোছল। ধর্মপালও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ দেন। তিনি কনৌজের রাজা ইন্দ্রায়ূধকে পরাজিত করেন এবং তাঁহার আশ্রিত চক্রায়ূধকে কনৌজের সিংহাসনে স্থাপন করেন। ধর্মপাল **পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর** উপাধি ধারণ করেন। কিন্তু ধর্মপালের বিজয়-সাফল্য অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। মালবের

প্রতিহার বংশের রাজা নাগভট্ট চক্রায়ুধকে পরাস্ত করিয়া কনৌজ রাজ্য দখল করেন। ইহার পর নাগভট্ট বঙ্গের দিকে অগ্রসর হন। এই সংবাদে ধর্মপালও নাগভট্টের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। বিহারের মুঙ্গেরের নিকট উভয়পক্ষে যুদ্ধ হয়। ধর্মপাল পরাজিত হন। কিন্তু এই পরাজয়ের ফলে পালসাম্রাজ্যের কোন ক্ষতি হয় নাই।

ধর্মপাল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম বিস্তারে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তিনি মগধে ও রাজশাহী জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুর নামক স্থানে দুইটি বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করেন। এই দুইটি মঠ যথাক্রমে **বিক্রমশীলা মহাবিহার ও সোমপুরী মহাবিহার** নামে খ্যাত। ধর্মপাল অপর ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁহার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন গর্গ নামে এক ব্রাহ্মণ। ধর্মপাল শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলিতেন।

দেবপাল (৮১০-৮৫০ খ্রীঃ)ঃ ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দেবপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার ন্যায় দেবপালও বীর যোদ্ধা ছিলেন। দেবপালের তাম্রলিপিতে উল্লিখিত আছে যে তাঁহার প্রভুত্ব দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত ও পশ্চিমে কাশ্মীরের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দেবপাল সর্বপ্রথম উড়িষ্যা ও কামরূপের দিকে অগ্রসর হইয়া এই দুই সীমান্ত রাজ্য জয় করেন। কামরূপের রাজা বিনাযুদ্ধেই দেবপালের বশ্যতা স্বীকার করেন। সেই সময় হিমালয়ের নিকটে হূণদের একটি রাজ্য ছিল। দেবপাল সেই রাজ্যটি জয় করিয়া কম্বোজ পর্যন্ত অগ্রসর হন। কম্বোজ রাজ্যটি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত ছিল। দেবপাল প্রতিহার বংশের রাজা প্রথম ভোজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার দর্প চূর্ণ করেন। ভারতের বাহিরেও দেবপালের খ্যাতি প্রসারিত হইয়াছিল।

দেবপালের সময় পালসাম্রাজ্য গৌরবের চরমশিখরে উঠিয়াছিল। সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপের অধিপতি মহারাজ বালপুত্রদেব দেবপালের নিকট দূত পাঠাইয়া নালন্দা-বিহারে একটি বৌদ্ধমঠ নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দেবপাল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি

বুদ্ধগয়ায় একটি বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি সাহিত্যানুরাগী ছিলেন।

অনুশীলনী

১। হর্যঙ্কবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান?
২। মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান?
৩। অশোকের জীবনী সংক্ষেপে লিখ।
৪। কলিঙ্গ-যুদ্ধের ফলে অশোকের কি পরিবর্তন হয়?
৫। প্রজার কল্যাণের জন্য অশোক কি কি কাজ করিয়াছিলেন?
৬। অশোকের কৃতিত্ব বর্ণনা কর।
৭। কি কি কারণে মৌর্যসাম্রাজ্যের পতন ঘটে?
৮। গুপ্তসাম্রাজ্যের উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছিল?
৯। সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয় সম্বন্ধে কি জান?
১০। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের জীবনী ও কৃতিত্ব আলোচনা কর।
১১। কি কি কারণে গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন ঘটে?
১২। কুষাণবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান?
১৩। প্রতিহারবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।
১৪। হর্ষবর্ধনের জীবনী ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর।
১৫। বাংলার প্রথম সার্বভৌম নরপতি কাহাকে বলা হয়? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান?
১৬। পালবংশের উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছিল? ধর্মপালের রাজ্যবিস্তার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারা

ভূমিকা ঃ মৌর্য শাসনকাল হইতে হর্ষবর্ধনের শাসনকাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি অব্যাহত ছিল। এই সময়ের মধ্যে ভারতবাসীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নবরূপায়ণ ঘটিতে থাকে। এই নবরূপায়ণের চিত্র আমরা চারিটি প্রধান সূত্র হইতে জানিতে পারি যথা—কৌটিল্যের **অর্থশাস্ত্র** এবং মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়েন ও হিউয়েন-সাং-এর বিবরণী।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ঃ কৌটিল্য বা চাণক্য ছিলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী ও উপদেষ্টা। কৌটিল্য রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানির নাম **অর্থশাস্ত্র**। রাজনীতি ও দেশ শাসন ছাড়াও অর্থশাস্ত্রে কৃষি, শিল্প প্রভৃতি বিষয়েও মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। বহু ক্ষেত্রে মেগাস্থিনিসের বিবরণের সহিত অর্থশাস্ত্রের যথেষ্ট মিল দেখা যায়।

অর্থশাস্ত্রে রাজ্যশাসন নীতি, পররাষ্ট্রনীতি, রাজার দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং রাজমন্ত্রিদের বিভিন্ন কার্যাদির বিবরণ আছে। ইহার বর্ণনা হইতে মনে হয় মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইত। রাজা ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বময় প্রভু, তাঁহার ক্ষমতা ছিল অসীম। কিন্তু তাঁহার দায়িত্ব সম্বন্ধে কঠোর শাস্ত্রীয় নির্দেশ ছিল। কৌটিল্যের মতে রাজার প্রধান কর্তব্য ছিল প্রজাদের মঙ্গলসাধন করা। রাজাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ ছিল। বিভিন্ন বিভাগের **অধ্যক্ষের** সাহায্যে রাজা শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। অর্থশাস্ত্রে ১৮টি শাসন বিভাগের উল্লেখ আছে। গুপ্তচরেরা রাজ্যের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া প্রজাদের সুখ-দুঃখের সংবাদ রাজাকে জানাইতেন।

রাষ্ট্র-শাসন ও রাজার কর্তব্য

রাষ্ট্রের প্রধান আয় ছিল ভূমি-রাজস্ব। উৎপন্ন শস্যের এক-চতুর্থাংশ রাজকর রূপে গ্রহণ করা হইত। ইহা ছাড়া, জলকর, জমির উপর সেস্ জাতীয় অতিরিক্ত করও আদায় করা হইত।

অর্থশাস্ত্রে রাজার বিচারালয়ের বর্ণনাও লিখিত আছে। ইহা ছাড়াও কৌটিল্য কয়েকটি নিম্ন বা সাধারণ বিচারালয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—**স্থানীয়, দ্রোণমুখ ও সংগ্রহণ**। গ্রামাঞ্চলেও সুষ্ঠু বিচার-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্র মামলাগুলির মীমাংসা করিতেন গ্রামীণ বা গ্রামিকগণ। অর্থশাস্ত্রে ১৮ রকমের দণ্ডবিধির নির্দেশ আছে। সেযুগে দণ্ডবিধি অত্যন্ত কঠোর ছিল। অর্থশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে মৌর্য সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ সাধারণতঃ রাজপরিবার হইতে নিযুক্ত হইতেন। ক্ষুদ্র প্রদেশগুলির শাসনভার রাষ্ট্রীয় উপাধিধারী কর্মচারীদের

প্রাদেশিক শাসন

হস্তে ন্যস্ত থাকিত। প্রতিটি প্রদেশ কয়েকটি জেলায় এবং প্রতিটি জেলা কয়েকটি গ্রামে বিভক্ত ছিল। জেলা ও গ্রামের শাসনকর্তাগণকে বলা হইত যথাক্রমে **স্থানিক ও গোপ**। গ্রামের পঞ্চবৃদ্ধ বা পঞ্চায়েৎ গ্রামের ভূমিচাষ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সম্প্রদায় সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলি পরিচালনা করিতেন। গোপ গ্রামের সমস্ত সম্পত্তি ও জনগণের জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যার তালিকা প্রস্তুত করিতেন। তাঁহারা স্থানীয় মন্দির, দোকান-বাজার, পান্থনিবাস প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করিতেন।

মেগাস্থিনিসের বিবরণঃ ব্যাবিলনের অধিপতি সেলিউকস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় এক দূত পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার নাম মেগাস্থিনিস। মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্রে কয়েক বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত **ইণ্ডিকা** নামক গ্রন্থে মৌর্য শাসনপদ্ধতি ও ভারতীয়দের সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায়।

মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন, ভারতে সেই সময় ছোট-বড় অনেক রাজ্য ছিল। উহাদের মধ্যে মগধই ছিল শ্রেষ্ঠ। মগধ রাজ্যটি ছিল খুব শক্তিশালী। উহার প্রায় ছয় লক্ষ পদাতিক, ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী, নয় সহস্র হস্তী ও একটি বিরাট নৌ-বাহিনী ছিল। মেগাস্থিনিস মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রের এক মনোজ্ঞ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। মৌর্য রাজধানী গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। ইহা

দৈর্ঘ্যে নয় মাইল ও প্রস্থে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত ছিল। শত্রুরা যাহাতে সহজে রাজধানী আক্রমণ করিতে না পারে সেজন্য নগরের চারিদিকে গভীর পরিখা ও কাষ্ঠ নির্মিত প্রাচীর ছিল। প্রাচীরের স্থানে স্থানে তোরণ ও গম্বুজ অবস্থিত ছিল। মেগাস্থিনিস মৌর্য সম্রাটের প্রাসাদের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। রাজপ্রাসাদের **নাম** ছিল **সুসঙ্গেয়**। প্রাসাদের চারিদিকে মনোরম উদ্যান ও পুষ্করিণী ছিল। প্রাসাদটি ছিল আগাগোড়া কাঠের তৈয়ারী ও নানারকম কারুকার্যে সজ্জিত। রাজসভার ঐশ্বর্য, আড়ম্বর, রাজার আমোদ-প্রমোদ ও দৈনন্দিন জীবনধারা সম্বন্ধেও মেগাস্থিনিস এক মনোজ্ঞ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার বিবরণ অনুযায়ী রাজ্য শাসনের জন্য বহু কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দুই শ্রেণীর উচ্চ রাজকর্মচারীর উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—**অগ্রণমোয় ও অষ্টমমোয়**। প্রথম শ্রেণীর কর্মচারীগণ রাজকর সংগ্রহ করিতেন এবং জলসেচ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্র নগরে পৌর শাসনব্যবস্থার বিবরণও লিখিয়াছেন। ত্রিশজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি সমিতি নগরের শাসনভার পরিচালনা করিত। তিনি ভারতবাসীর চরিত্রের বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন।

শাসনব্যবস্থা

দেশে চুরি-ডাকাতি ছিল না বলিলেই চলে। জনসাধারণ সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিত। বিরোধ মীমাংসার জন্য কেহ আদালতে যাইত না। আপোষের দ্বারাই সকল বিরোধের মীমাংসা করা হইত। ধর্মানুষ্ঠান ছাড়া কেহ মদ্যপান করিত না। জনগণ সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করিলেও উহারা অলংকারাদি ব্যবহার করিত। মেগাস্থিনিস ভারতীয়গণকে সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন যথা—ব্রাহ্মণ, কৃষক, পশুপালক, শিল্পী, যোদ্ধা, পরিদর্শক ও সভাসদ। বৃত্তি হিসাবেই তিনি ভারতীয় সমাজকে এইভাবে ভাগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতীয়রা কাহাকেও ক্রীতদাসরূপে রাখিতেন না। কিন্তু এই উক্তিটি

সমাজ, শ্রেণী ও জীবিকা

সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ও অশোকের শিলালিপিতে দাস-প্রথার উল্লেখ আছে।

তিনি বলেন, কৃষি ও পশুপালন ভারতীয়দের প্রধান উপজীবিকা ছিল। কৃষির প্রতি রাষ্ট্রের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। জমিতে জলসেচের সুবন্দোবস্ত ছিল। দেশে দুর্ভিক্ষ ছিল না। এই যুগে শিল্পকলা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যও উন্নত ছিল। দণ্ডবিধি কঠোর ছিল। সামান্য অপরাধেও গুরুদণ্ড দেওয়া হইত।

জীবিকা

মেগাস্থিনিস ভারতীয় শিল্পকলার প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায়, নদী ও সমুদ্রের নিকটবর্তী নগরসমূহের গৃহগুলি কাষ্ঠ নির্মিত ছিল। নগরের অভ্যন্তরে গৃহগুলি ছিল ইষ্টক নির্মিত। পাটলিপুত্র নগরে কাষ্ঠ নির্মিত প্রাসাদ, রাজপথ, উদ্যান এবং পয়ঃপ্রণালী মেগাস্থিনিসকে বিস্মিত করিয়াছিল।

শিল্পকলা

ফা-হিয়েনের বিবরণ ঃ চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি ভারতে মথুরা, কনৌজ, বারাণসী, কপিলাবস্তু, বৈশালী, পাটলিপুত্র পেশোয়ার (বর্তমানে পাকিস্তান রাষ্ট্রে অবস্থিত) প্রভৃতি বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলি পরিদর্শন করেন।

ফা-হিয়েন দেশের অবস্থা সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি পাটলিপুত্রে তিন বৎসর অবস্থান করিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষালাভ করেন। তিনি পাটলিপুত্র নগরে অশোকের ভগ্ন রাজপ্রাসাদ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি পাটলিপুত্রের নাগরিকদের স্বচ্ছল জীবনযাত্রা ও উহাদের দানশীলতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। পথিকদের সুবিধার জন্য রাজপথের স্থানে স্থানে বিশ্রামাগার ছিল। পাটলিপুত্র নগরে দরিদ্র ও দুঃস্থ রোগীদের আরোগ্যশালা ও অনাথ-আশ্রম ছিল।

ফা-হিয়েন গুপ্তশাসন প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। দেশের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিত। রাজকর্মচারীগণ ছিলেন

দায়িত্বশীল। রাজ্যে প্রজা-উৎপীড়ন ছিল না বলিলেই চলে। দণ্ডবিধি বিশেষ কঠোর ছিল না। প্রজাগণ উৎপন্ন শস্যের এক নির্দিষ্ট অংশ রাজকররূপে প্রদান করিত।

শাসনব্যবস্থা

ফা-হিয়েন মধ্যদেশের সমৃদ্ধির কথা বলিয়াছেন। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে একমাত্র চণ্ডাল ব্যতীত কেহ মদ বা মাংস খাইত না। দস্যু-তস্করের উপদ্রব ছিল না এবং জনসাধারণ শান্তিতে জীবন-যাপন করিত। মেগাস্থিনিসের ন্যায় ফা-হিয়েনও ভারতবাসীর নৈতিক চরিত্র ও রীতিনীতির প্রশংসা করিয়াছেন। সমাজে চণ্ডালগণ অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া বিবেচিত হইত। পশুবধ শুধু চণ্ডাল বা নীচ জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। তবে উহারা নগরে প্রবেশ করিত না, নগরের বাহিরেই বসবাস করিত।

ভারতীয় চরিত্র

তিনি ভারতবাসীর ধর্মীয় উদারতার কথা বলিয়াছেন। গুপ্তরাজগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন বটে কিন্তু অপর ধর্মের প্রতিও তাঁহারা উদার মনোভাব পোষণ করিতেন। ফা-হিয়েন বলেন বৌদ্ধধর্ম বাংলা ও পাঞ্জাবে অধিক জনপ্রিয় ছিল কিন্তু মধ্যদেশে (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) হিন্দুধর্মই প্রধান ছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তিনি বলেন গুপ্তযুগে তাম্রলিপ্ত বঙ্গদেশের একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষা ও বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। তাম্রলিপ্ত হইতে ভারতীয় বণিকগণ সিংহল, মালয়, যবদ্বীপ প্রভৃতি দূর দেশে বাণিজ্য করিতে যাইত। ফা-হিয়েন বলেন গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলের লোকেরা আড়ম্বরের সহিত দেব-দেবীর মূর্তিসহ শোভাযাত্রা করিত। পূজা-পার্বণের উৎসব আকর্ষণীয় ছিল।

হিউয়েন-সাং-এর বিবরণ ঃ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং ভারতে আসেন। কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের সন্ধানে তিনি ভারতের প্রধান বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলি পরিদর্শন করেন। তাঁহার রচিত বিবরণী হইতে হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থা, তাঁহার দানশীলতা এবং সেযুগের শিক্ষা, সাহিত্য ও ভারতবাসীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়।

হিউয়েন-সাং হর্ষবর্ধনকে প্রজাহিতৈষী রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রাজা নিজে রাজ্যমধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া শাসনকার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। রাজাকে সাহায্য করার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ ছিল। রাজকর নিতান্তই কম ছিল। বিনা পারিশ্রমিকে কাহাকেও বেগার খাটান হইত না। জনসাধারণের সুবিধার জন্য সরাইখানা, বিশ্রামাগার ও দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল।

উন্নত শাসনব্যবস্থা



হিউয়েন-সাং

হিউয়েন-সাং বলেন, বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগী হইলেও হর্ষবর্ধন অপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল। হিউয়েন-সাং হর্ষবর্ধন কর্তৃক আয়োজিত কনৌজের ধর্মসভা ও প্রয়াগের পঞ্চবার্ষিকী মেলার প্রশংসা করিয়াছেন। প্রয়াগের মেলা মহামোক্ষক্ষেত্র নামে পরিচিত ছিল। অন্যতম তীর্থস্থান বারাণসীর হিন্দু মন্দিরগুলির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য হিউয়েন-সাং-কে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

ধর্ম-সহিষ্ণুতা

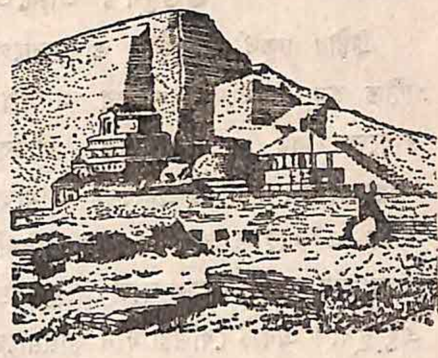
হিউয়েন-সাং ভারতীয়দের সাধুতা, সরলতা ও ন্যায়পরায়ণতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। জনসাধারণের মধ্যে বেশ-ভূষার কোন বাহুল্য ছিল না। উহারা সাদা পোষাক অধিক পছন্দ করিত। জনসাধারণের জীবনযাত্রা ছিল অনাড়ম্বরপূর্ণ। সমাজে বর্ণ প্রথা প্রচলিত ছিল। ভারতবাসী জ্ঞানী ও গুণীর সমাদর করিত। বাংলার অধিবাসীরা কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকায়, বিদ্যানুরাগী ও ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। বাংলায় বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক বজায় ছিল। তথায় বৌদ্ধদের ত্রিশটি মঠ ও হিন্দুদের একশত মন্দির ছিল। তিনি তাম্রলিপ্তের সমৃদ্ধির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

ভারতীয়দের চরিত্র

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় (পাটনা জেলায়) সম্বন্ধে হিউয়েন-সাং এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়াছেন।

নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়

এই সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবের চরম শিখরে উঠিয়াছিল। ইহা ছিল সেযুগের শিক্ষার প্রধান পীঠস্থান। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দশ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করিত। ইহাদের মধ্যে অনেকে বিদেশী ছাত্র ছিল। বেদ, ব্যাকরণ, ন্যায়, আয়ুর্বেদ, গণিত, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে এখানে পঠন-পাঠন চলিত।



নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ

হিউয়েন-সাং দক্ষিণ ভারতে অমরাবতীর বৌদ্ধ বিহার, নাগার্জুনকুণ্ড কাঞ্চী ও মহাবলীপুরম পরিদর্শন করেন। তিনি এই অঞ্চলে শত শত বৌদ্ধ মঠের সহিত বহু হিন্দু মন্দিরও পরিদর্শন করেন। তিনি বলভীর অধিবাসীদের (বর্তমান জুনাগড়) সমৃদ্ধির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

অনুশীলনী

১। অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা কে ছিলেন? এই গ্রন্থ হইতে আমরা কি জানিতে পারি?

২। মেগাস্থিনিস কে ছিলেন? তিনি ভারত সম্পর্কে কি বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন?

৩। ফা-হিয়েন কোন্ সময় ভারতে আসেন? ভারতে আসিয়া তিনি কি দেখিয়াছিলেন?

৪। হিউয়েন-সাং কোন্ সময় ভারতে আসেন? তিনি ভারতীয়দের সম্বন্ধে কি বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন?

৫। হিউয়েন-সাং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গুপ্তযুগ ঃ ভারতের সুবর্ণ যুগ

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতে এক নূতন সাম্রাজ্য গঠিত হয়। বিদেশী শক্তির আধিপত্য বিনষ্ট করিয়া যে রাজবংশ ভারতের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক গৌরব পুনরুদ্ধার করে তাহার নাম **'গুপ্ত বংশ'**। এই রাজবংশের আমলে একদিকে যেমন ভারতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি স্থাপিত হয়, তেমনি অন্যদিকে শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অপূর্ব বিকাশ ঘটে। সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্পের উৎকর্ষতা এই যুগকে একটি বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন যে সকল দিক দিয়া ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির এরূপ উন্নতি ইতিপূর্বে হয় নাই। গ্রীসের পেরিক্লিসের যুগকে যেমন স্বর্ণ যুগ বলা হয়, তেমনি গুপ্ত যুগকেও ভারতের সুবর্ণ যুগ বলা হয়। অনেকে ভারতের গুপ্তযুগকে ইংল্যাণ্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথের যুগের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এক কথায় গুপ্তযুগকে ভারতীয় মণীষার চরম উন্নতি ও পূর্ণ বিকাশের যুগ বলা যায়।

রাষ্ট্রীয় ঐক্য ঃ অর্থ-নৈতিক উৎকর্ষতা

গুপ্ত সম্রাটগণ সামরিক প্রতিভারও অধিকারী ছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় নীতির ফলে ভারতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপিত হয় এবং শক, কুষাণ, হূণ, প্রভৃতি বিদেশী জাতিগুলির প্রভুত্বের অবসান ঘটে। গুপ্ত সম্রাটদের ইহা কম কৃতিত্বের কথা নয়। গুপ্ত সম্রাটগণ শুধু সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারেও তাঁহারা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে দেশের সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়; দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসে। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের যুগে ভারতে যে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইয়াছিল, গুপ্তরাজগণের সুশাসনের ফলে তাহার অবসান ঘটে। ফা-হিয়েন লিখিয়াছেন যে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ছিল উন্নত। শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হওয়ায় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়। ইহার ফলে ভারত ধনৈশ্বর্যে শক্তিশালী

ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। গুপ্তযুগেই সিংহল, মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। ভারতীয় বণিকগণ এই সকল অঞ্চলে ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার বাণী প্রচার করেন এবং ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া তোলেন। এই সব অঞ্চলে আজও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির নিদর্শন রহিয়াছে।

সাহিত্যের বিকাশ

গুপ্তযুগে সাহিত্যের এক অপূর্ব বিকাশ ঘটিয়াছিল। গুপ্তযুগ সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণ যুগ। গুপ্ত সম্রাটদের অনেকেই বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত স্বয়ং একজন প্রতিভাবান কবি ছিলেন। তাঁহার সভাকবি হরিষেণ একটি বিরাট রাজপ্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী নরপতি ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক বলা হইয়া থাকে। তাঁহার মন্ত্রী বীরসেন একজন খ্যাতি সম্পন্ন কবি ছিলেন। ইংরাজ ঐতিহাসিক স্মিথ বলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ভাব বিনিময়ের ফলেই ভারতীয় মনীষার এই অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটিয়াছিল। এই যুগে হিন্দুশাস্ত্র ছাড়াও বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়। এই যুগেই বহু সংখ্যক খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও কবির আবির্ভাব ঘটে। এই যুগেই গুপ্ত রাজসভায় কালিদাস প্রমুখ নবরত্নের সমাবেশ হইয়াছিল। কালিদাস ছিলেন এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার রচিত **রঘুবংশ, শকুন্তলা, মেঘদূত, কুমার সম্ভব, মালবিকাগ্নিমিত্রম,** প্রভৃতি কাব্য ও নাটকগুলি বিশ্ব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। **রঘুবংশে** প্রাচীন রাজাদের কীর্তি হইতে আরম্ভ করিয়া রামচন্দ্রের জীবন চরিত বর্ণিত আছে। **কুমার সম্ভবে** হরপার্বতীর তপস্যা, পরিণয় ও কার্তিকের জন্মকথা সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। **শকুন্তলা** নাটকে রাজা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার কাহিনী বর্ণিত আছে। **মৃচ্ছকটিক** রচয়িতা শূদ্রক, **মুদ্রারাক্ষস** প্রণেতা বিশাখদত্ত, **এলাহাবাদ** প্রশস্তির রচয়িতা হরিষেণ প্রভৃতি মনীষীগণ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অমূল্য সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন।

এই যুগে নানা স্মৃতিশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল এবং সেগুলির নিয়ম

অনুসারে ধর্ম, জীবন ও সমাজ নিয়ন্ত্রিত ছিল। রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য দুইখানিও এইযুগে পরিমার্জিত হয়।

সাহিত্য ছাড়া জ্যোতিষ, গণিত, রসায়ণ প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানেও ভারতীয় মনীষার অপূর্ব বিকাশ ঘটে। আর্যভট্ট ও বরাহমিহির ছিলেন এই যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। বরাহমিহির রচিত **পঞ্চসিদ্ধান্তিকা** গ্রন্থে রোমান জ্যোতিষশাস্ত্রের উল্লেখ আছে। ভেষজতত্ত্ব, অস্ত্রোপচার প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা সে সময় বেশ উন্নত ছিল। অনেকের মতে শল্যবিদ্যা-বিশারদ শুশ্রূত গুপ্তযুগেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শুশ্রূতের রচিত **চরক-সংহিতা** চিকিৎসাশাস্ত্রের একখানি অমূল্য গ্রন্থ। ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র চর্চা করিয়াই পরবর্তীকালে আরববাসীরা ও গ্রীকরা এই শাস্ত্রে উন্নতি লাভ করে। বৌদ্ধ চিকিৎসকেরা রোগ নিরাময় করিবার নানা উপায় উদ্ভাবন করেন। তাহা হইতেই ভেষজতত্ত্বের চর্চা শুরু হয়।

বিজ্ঞানের বিকাশ

ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে গুপ্তযুগ এক গৌরবময় যুগ। এই যুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। গুপ্ত-যুগের শিল্পরীতি বহুদিন ভারতে প্রচলিত থাকে। গুপ্তযুগের পূর্বে হিন্দুধর্মে দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণের বিশেষ প্রচলন ছিল না। কিন্তু এই যুগে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি নির্মিত হয়। ইহাদের মধ্যে মথুরার বুদ্ধমূর্তি ও সারনাথের প্রস্তর নির্মিত বুদ্ধ-মূর্তি এবং দেওগাঁয়ের (মধ্য-প্রদেশ) শিব ও বিষ্ণুমূর্তি বিশেষ বিখ্যাত। গুপ্তযুগের মূর্তিশিল্পে ভারতীয় শিল্প-নৈপুণ্যের চরম বিকাশ ঘটে। মূর্তি নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে মন্দির-নির্মাণ শিল্পও এই যুগে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। দেওগাঁয়ে অবস্থিত একটি প্রস্তর নির্মিত মন্দির এবং ঐ মন্দিরের শিব, বিষ্ণু ও অপরাপর দেবদেবীর মূর্তি এই যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের চমৎকার নিদর্শন। গুপ্তযুগের মন্দিরগুলি একতল হইতে ষোড়শতল পর্যন্ত উচ্চ ছিল। মধ্য-প্রদেশের ভিতরগাঁয়ের মন্দিরগুলি গুপ্ত স্থাপত্য-শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। সারনাথে এই যুগের ভাস্কর্য শিল্পের বহু নিদর্শন আছে।

শিল্পকলার উৎকর্ষতা

গুপ্তযুগে চিত্রশিল্পেরও অপূর্ব বিকাশ ঘটিয়াছিল। হায়দ্রাবাদের নিকটে অজন্তা গুহাচিত্রের অধিকাংশই গুপ্তযুগের অবদান। অজন্তার গুহাগাত্রে অঙ্কিত চিত্রগুলি আজও জগতের বিস্ময় উৎপাদন করে। পাহাড় কাটিয়া উনত্রিশটি প্রশস্ত গুহা এখানে নির্মাণ করা হইয়াছে। কোন কোন গুহার প্রবেশ পথে অপরূপ সিংহদ্বার অবস্থিত। গুহার ভিতরে ছাদের দিকে নানা প্রকার লতাপাতা, হংস-হংসী প্রভৃতির চিত্র নানা বর্ণে চিত্রিত আছে। গুহার দেওয়ালগুলিও অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত। অজন্তার অধিকাংশ চিত্রই বুদ্ধের জীবনী ও সেকালের রাজাদের কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত। সকল শ্রেণীর ভারতবাসীরই জীবনের কাহিনী অজন্তার গুহাচিত্রে অঙ্কিত দেখা যায়। অজন্তাকে 'ভারতের শিল্পতীর্থ' বলা যায়।

অজন্তার চিত্রশিল্প

পরধর্মসহিষ্ণুতা গুপ্তযুগের অপর এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। গুপ্তরাজগণ হিন্দুধর্মের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বটে, কিন্তু পরধর্মের প্রতিও তাঁহারা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। গুপ্তরাজগণ বৌদ্ধগণকে রাজকার্যে নিযুক্ত করিতেন। জৈনগণ ব্রাহ্মণদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন। গুপ্তযুগে ধর্মীয় উদারতা চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনকে মুগ্ধ করিয়াছিল। শৈব ও বৈষ্ণবগণ জৈন তীর্থংকরগণকে দেবতাজ্ঞানে উপাসনা করিতেন। সুতরাং ধর্মের দিক দিয়াও গুপ্তযুগকে 'ভারতের স্বর্ণ যুগ' বলা যায়।

পরধর্মসহিষ্ণুতা

অনুশীলনী

১। গুপ্তযুগকে 'ভারতের স্বর্ণ যুগ' বলা হয় কেন ?
২। গুপ্তযুগে সাহিত্য ও শিল্পকলার কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল ?
৩। অজন্তার গুহাশিল্প সম্বন্ধে কি জান ?
৪। কবি কালিদাসের কয়েকখানি কাব্য ও নাটকের নাম কর।
৫। গুপ্তযুগে বিজ্ঞানের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল ?
৬। শুশ্রূত কে ছিলেন ? তাঁহার রচিত একখানি গ্রন্থের নাম কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

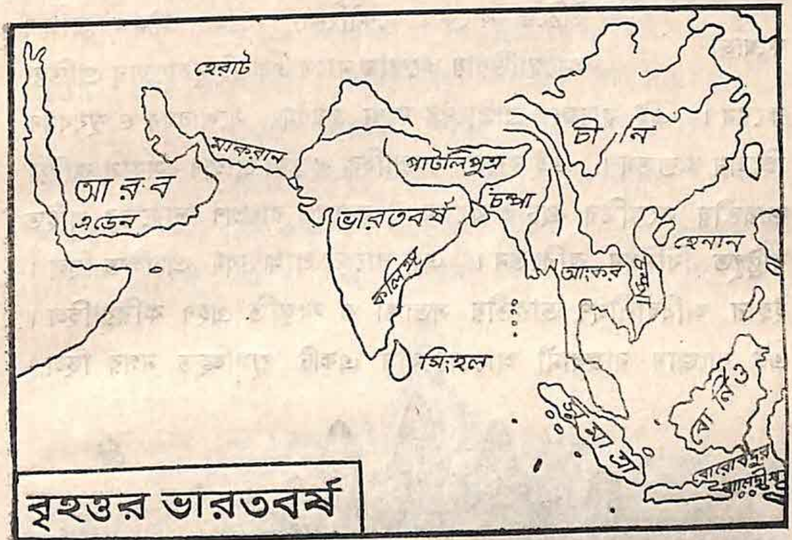
ভারত ও উহার প্রতিবেশী

প্রাকৃতিক বেষ্টনীর মধ্যে থাকা সত্ত্বেও অতি প্রাচীনকাল হইতে বহির্জগতের সহিত ভারতের রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল। মৌর্যযুগ হইতে ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়ে। শিক্ষা, ধর্ম ও বাণিজ্যের সূত্র ধরিয়া বহু ভারতীয় এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গমন করে ও সেই সকল স্থানে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করে। ফলে এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠে এবং ক্রমে ক্রমে ভারতীয় রাজবংশ স্থাপিত হয়। মৎস্য-পুরাণে ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে বহির্জগতে স্থাপিত ভারতীয় উপনিবেশগুলিকে ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে অভিহিত করা হইয়াছে।

বৃহত্তর ভারতের আদর্শ

ভারত ও মধ্য-এশিয়া : সিন্ধু-সভ্যতার যুগ হইতেই ভারতের সহিত মধ্য-এশিয়ার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে থাকে। এই অঞ্চলে রাজ্যলোভে কোন ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ অরেলস্টাইন মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ও ভারতীয় ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খোটান অঞ্চলে আবিষ্কৃত মুদ্রা ও লিপিগুলি ভারতীয় ভাষায় উৎকীর্ণ। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল গোমতি বৌদ্ধবিহার। এই বিহারে বহু ভারতীয় ছাত্র শিক্ষালাভের জন্য আসিত। খোটান, কাসগড়, ইয়ারখন্দ প্রভৃতি অঞ্চলে যে সকল রাজকর্মচারীদের নাম পাওয়া গিয়াছে তাহাও সম্পূর্ণ ভারতীয় বলিয়া পরিচিত, যথা—ভীম, ভঙ্গসেন, নন্দসেন ইত্যাদি। মনে হয় কুষাণ ও পরবর্তী যুগে মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার ঘটিয়াছিল। মধ্য-এশিয়ার কুচী, তুরফান প্রভৃতি অঞ্চলে

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বড় বড় কেন্দ্র ছিল। এই অঞ্চল হইতে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ক্রমে চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে প্রসার লাভ করে। হিউয়েন-সাং চীন হইতে ভারতে আগমনের পথে সর্বত্র বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।



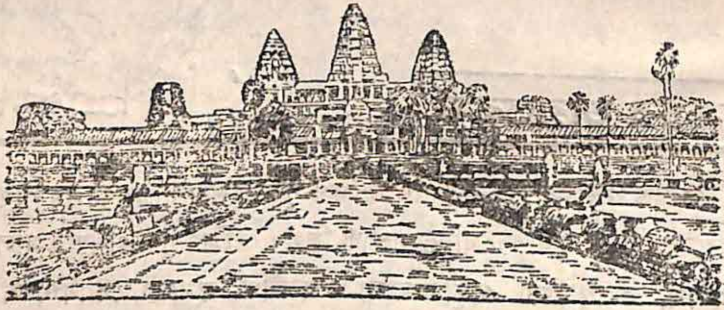
বৃহত্তর ভারতবর্ষ

ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সহিত ভারতের বহুকাল ধরিয়া ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয় উপদ্বীপ, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি রাজ্য ও যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্ণিও, বলি প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ সমগ্রভাবে **সুবর্ণভূমি** নামে পরিচিত। এই অঞ্চলের অরণ্য সম্পদ, খনিজ সম্পদ ও অন্যান্য ঐশ্বর্য সর্বদাই ভারতীয় বণিকগণকে আকৃষ্ট করিত। এই সকল কারণেই ভারতবাসী এই অঞ্চলের নাম দিয়াছিল সুবর্ণভূমি। ভারতীয় বণিকগণ এবং স্বদেশত্যাগী ভারতীয় রাজা বা রাজপুত্রগণ এই অঞ্চলে রাজ্য স্থাপনও করিয়াছিলেন। গুপ্তযুগে ভারতবাসী ঐশ্বর্যের সন্ধানে অথবা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বহির্ভারতে যাত্রা করিয়াছিল ; ফলে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বহু উপনিবেশ ও রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। ভারতের পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট অঞ্চল হইতে

ভারতীয়গণ সমুদ্রপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে গমন করিত। তাম্রলিপ্ত, ভৃগুকচ্ছ প্রভৃতি বন্দর হইতেও ভারতীয়রা সমুদ্রপথে এইসকল দেশে যাতায়াত করিত।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে আনাম, কোচিন-চীন এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য দ্বীপগুলিতে হিন্দু উপনিবেশ ও রাজ্য গড়িয়া উঠিতে থাকে। কৌণ্ডিল্য নামে জনৈক ব্রাহ্মণ কাম্বোডিয়ায় **কম্বোজ** নামে এক হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজ্যের রাজাদের মধ্যে জয়বর্মণ, যশোবর্মণ ও সূর্যবর্মণ ছিলেন অন্যতম। এই রাজ্যে সহস্রাধিক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বসবাস করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার করেন। কম্বোজ রাজগণ ভারতের সহিত রাষ্ট্রদূত বিনিময় করিতেন। এই রাজ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রচলিত ছিল। ইহার অধিবাসীগণ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়াছিল। এই রাজ্যের রাজধানী আঙ্কোরথোম একটি সুসজ্জিত নগর ছিল।

কম্বোজ



আঙ্কোরভাটের বিষ্ণু-মন্দির

আঙ্কোরভাটের বিষ্ণু-মন্দির হিন্দু স্থাপত্য-শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন।

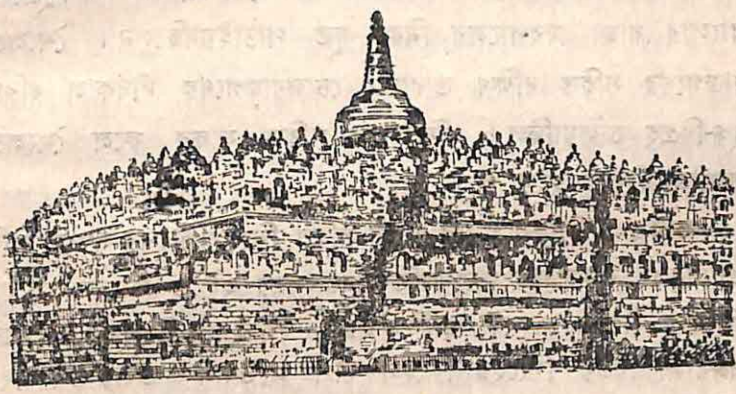
চম্পা

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে কম্বোজের পূর্ব-সীমান্তে **চম্পায়** অপর একটি হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয়। প্রায় বারোশত বৎসর ধরিয়া চম্পা রাজ্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। এই রাজ্যের শক্তিশালী রাজাদের মধ্যে জয়পরমেশ্বর বর্মণ, রুদ্রদমণ ও জয়সিংহ বর্মণ ছিলেন অন্যতম। চম্পা রাজ্য হিন্দু-সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। তথায় হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মই

প্রচলিত ছিল। এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব পূজার প্রচলন বেশী ছিল। চম্পায় বৈষ্ণব ধর্মেরও কিছু প্রচলন ছিল। চম্পার অধিবাসীগণ ক্রমে ক্রমে ভারতীয় পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করে। সমাজে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দু পূজা-পার্বণ সর্বত্র প্রচলিত ছিল। চম্পার রাষ্ট্রভাষা ছিল সংস্কৃত। চম্পার মন্দিরগুলিতে ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

যবদ্বীপ

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অপর কেন্দ্র ছিল যবদ্বীপ। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে যবদ্বীপে ভারতীয়দের বসবাস শুরু হয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত যবদ্বীপে হিন্দু-সভ্যতা ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ থাকে। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। যবদ্বীপে সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক প্রচলন ছিল। তথায় বৌদ্ধধর্মও প্রচলিত ছিল।



বরোবুদুরের মন্দির

শৈলেন্দ্র রাজবংশের আমলে যবদ্বীপে সুপ্রসিদ্ধ বরোবুদুরের বৌদ্ধ মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল। মন্দিরটি পরস্পর নয়টি স্তরে নির্মিত। মন্দিরের প্রধান বিগ্রহ ছিল বুদ্ধমূর্তি। এই মন্দিরটি পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। এই মন্দিরটি ভারতীয় ভাস্কর্য ও স্থাপত্য-শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। ভারতীয় সমাজের অনুকরণে যবদ্বীপের সমাজ-জীবন গঠিত হয়। রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যান অবলম্বনে যবদ্বীপে বহু কাব্য ও গল্প-সাহিত্য রচিত হইয়াছিল।

অষ্টম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্ণিও, বলিদ্বীপ, মালয় প্রভৃতি দেশগুলি এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণ বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাঙ্গালী বৌদ্ধাচার্য কুমার ঘোষ ছিলেন এই বংশের রাজগুরু। কুমার ঘোষের উৎসাহে ও প্রচেষ্টায় শৈলেন্দ্র রাজগণ বিখ্যাত তারা-র মন্দিরটি নির্মাণ করিয়াছিলেন।

শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য

আরব পর্যটক খোরদাদ্‌জ-বে বলিয়াছেন যে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের দৈনিক আয় ছিল দুইশত মণ স্বর্ণ এবং রাজা প্রতিদিন একটি স্বর্ণনির্মিত ইষ্টক জলদেবতাকে উৎসর্গ করিতেন।

একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সাম্রাজ্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। নালন্দায় একটি বৌদ্ধমঠ নির্মাণের জন্য শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্রদেব বাংলার রাজা দেবপালের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। শৈলেন্দ্র রাজগণের সহিত দক্ষিণ ভারতের চোলরাজগণের দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিয়াছিল। সিংহলের সহিত যুদ্ধের ফলে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য হীনবল হইয়া পড়ে।

ভারত ও সিংহল ঃ ভারতের সহিত সিংহল দ্বীপের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। রামচন্দ্রের লঙ্কা-অভিযানের সময় হইতে ভারতের সহিত সিংহল দ্বীপের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইহার পর খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে বঙ্গবাসী বিজয় সিংহের সিংহল দ্বীপ অভিযান ও তথায় উপনিবেশ স্থাপনের উল্লেখ বৌদ্ধধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায়। কথিত আছে, বিজয় সিংহ সিংহলের রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোক ধর্মপ্রচারের জন্য স্বীয় পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে সিংহলে পাঠাইয়াছিলেন। সিংহলের রাজা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। ইহার পর হইতে ক্রমে ক্রমে সিংহল দ্বীপে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটিতে থাকে এবং ভারত ও সিংহলের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইতে থাকে। সিংহলের অনুরাধাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারত ও তিব্বত ঃ ভারতের সহিত তিব্বতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অতি প্রাচীন। ভারত হইতেই তিব্বত উহার সভ্যতা ও সংস্কৃতি লাভ করিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে জনৈক তিব্বতী নায়ক স্রোং-সান তিব্বতে এক স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁহার পুত্র স্রোং-সান্-পো সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আসাম ও নেপাল জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রচলন শুরু হয়। তিনি নেপালের রাজকন্যা ও চীনের এক রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। তাঁহার দুই মহিষী ছিলেন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিতা। তাঁহাদের প্রভাববশতঃ তিব্বতের রাজা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে ক্রমে তিব্বতের বহু স্থানে বৌদ্ধমঠ নির্মিত হয় এবং তিব্বতের জনগণের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। ভারত হইতে বহু বৌদ্ধমূর্তি ও বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ তিব্বতে আনা হয়। রাজা স্রোং-সান্-পো তিব্বতে সংস্কৃত ভাষার প্রচলন শুরু করেন। স্রোং-সান্-পো ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ৭০৫ হইতে ৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিব্বতের রাজা মাস-সোম ভারতে একাধিক অভিযান প্রেরণ-করেন। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে ললিতাদিত্য, যশোবর্মণ প্রভৃতি ভারতীয় নৃপতিগণ চীনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইহার পর হইতে ভারতের সহিত তিব্বতের পুনরায় সাংস্কৃতিক যোগাযোগ শুরু হয়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য শান্তি রক্ষিতকে তিব্বতে আমন্ত্রণ করা হয় এবং তিনি তিব্বতের রাজ-পুরোহিত পদে নিযুক্ত হন। শান্তি রক্ষিতের চেষ্টায় বহু বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করা হয়।



অতীশ দীপঙ্কর

তিব্বতের রাজার অনুরোধে একাদশ শতাব্দীতে অতীশ দীপঙ্কর

বৌদ্ধধর্মের সংস্কারের জন্য তিব্বতে আগমন করেন। আজও তিব্বতীয়রা অতীশ দীপঙ্করকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করেন।

ভারত ও চীন ঃ অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের সহিত চীনের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা চীনের সংস্কৃতি প্রভাবিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় অব্দে চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চীন-সম্রাট ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম-প্রচারকদের চীনে লইয়া যাইবার জন্য দূত পাঠাইয়াছিলেন। চীন-সম্রাটের আমন্ত্রণে বৌদ্ধাচার্য ধর্মরত্ন ও কাশ্যপ-মাতঙ্গ চীনে গমন করেন। ইঁহারা চীনা ভাষায় বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র অনুবাদ করেন। কুষাণদের আমলে বহু বৌদ্ধাচার্য চীনে গমন করেন এবং তথায় ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচার করেন। অপরদিকে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাং ও ইৎ-সিং বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের অন্বেষণে ভারতে আগমন করেন। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে চীনে ১৮০টি বৌদ্ধমঠ নির্মিত হয়। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রায় তিন সহস্র ভারতীয় চীনে বসতি স্থাপন করে। যশোগুপ্ত, জ্ঞানভদ্র প্রভৃতি বৌদ্ধ আচার্যগণ বাংলা হইতে চীনে গমন করিয়াছিলেন। সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সহিত চীনের বাণিজ্যিক যোগাযোগও ঘটে। চীনের শিল্পের উপর ভারতীয় শিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট। চীনের বৌদ্ধ গুহামন্দিরগুলির মধ্যে তুন-হোয়াং-এর **সহস্র বুদ্ধগুহা** বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারত ও ব্রহ্মদেশ ঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বেই ব্রহ্মদেশে হিন্দু-সভ্যতার প্রসার ঘটে। অনেকের মতে বুদ্ধের সময় ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ শুরু হয়। কথিত আছে যে তাপুসা ও বালুকা নামে দুই বণিক ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে আসেন ও বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ক্রমে ক্রমে আরাকান, পেগু, থাটোন প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হয়। চৈনিক সূত্র হইতে জানা যায় যে মধ্য-ব্রহ্মদেশে এক লক্ষেরও অধিক বৌদ্ধ ও এক হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন। **শ্রীক্ষেত্র** নামে এক হিন্দু রাজ্য ব্রহ্মদেশে বহুদিন স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল। আরাকান অঞ্চলেও

দুইটি হিন্দু রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি রাজবংশের নাম ছিল **শ্রীধর্মরাজানুজ** বংশ। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে মধ্য-ব্রহ্মদেশে **পাগান** রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার রাজধানীর নাম ছিল **অরিমর্দনপুর**। পাগান রাজবংশের আমলে ব্রহ্মদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার ঘটে। ব্রহ্মদেশের সাহিত্য, শিল্প ও বিচার-প্রণালীতে ভারতীয় আদর্শের প্রভাব সুস্পষ্ট। **মনু, নারদ** ও যাজ্ঞবল্কের রচিত ধর্মশাস্ত্রের ভিত্তির উপর ব্রহ্মদেশের আইন রচিত হয়।

অনুশীলনী

১। মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব কিরূপ হইয়াছিল ?

২। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপন এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিস্তারের ইতিহাস লিখ।

৩। সিংহলের সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ কিরূপ ছিল ?

৪। চীনের সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের নিদর্শনগুলি উল্লেখ কর।

৫। তিব্বতে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারের বিবরণ দাও।

৬। ভারতের সহিত ব্রহ্মদেশের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ কিরূপ ছিল ?

৭। ভারতের সহিত তিব্বতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বর্ণনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতে বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

যুগে যুগে ভারতের রাষ্ট্রীয় দুর্বলতার সুযোগে গ্রীক ও মধ্য-এশিয়ার জাতিগুলি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ভিতর দিয়া ভারত আক্রমণ করে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে উহাদের প্রভুত্ব স্থাপন করে। কিন্তু উহারা বিনা বাধায় ভারতে রাজ্য জয় করিতে পারে নাই। ভারতীয় নৃপতিগণ উহাদের প্রতিরোধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন এবং কেহ কেহ সাফল্য লাভও করিয়াছিলেন।

আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে পুরুর প্রতিরোধ

খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে ম্যাসিডনের গ্রীকরাজ **আলেকজাণ্ডার** ভারত অভিযানে অগ্রসর হন। তাঁহার অভিযানের তিনটি উদ্দেশ্য ছিল, বিশ্বজয়ের আকাঙ্ক্ষা, সমগ্র বিশ্বে গ্রীক সভ্যতার প্রসার এবং ব্যক্তিগত ও সামরিক মর্যাদালাভ। আলেকজাণ্ডার হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া ভারতের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। সেই সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। উহাদের মধ্যে কোনরূপ ঐক্য ছিল না এবং উহাদের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহেরও অন্ত ছিল না। সুতরাং সুসজ্জিত গ্রীক বাহিনীর পক্ষে ভারতে প্রবেশ করা সহজ হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রাজ্যগুলি (যথা, ক্ষুদ্রক, মালব ইত্যাদি) সহজেই আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করে। ইহার পর কাবুল উপত্যকার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া আলেকজাণ্ডার তক্ষশীলায় প্রবেশ করেন। তক্ষশীলার রাজা অম্ভি বিনা যুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তক্ষশীলা হইতে আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া আলেকজাণ্ডার ঝিলাম নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন। এই অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন **পুরু**। আলেকজাণ্ডার পুরুকে আত্মসমর্পণের জন্য আদেশ করেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা বীর পুরু তাহা ঘৃণাভরে অগ্রাহ্য করেন। জনৈক গ্রীক

ঐতিহাসিকের মতে পুরুর সৈন্যবাহিনীতে ৩০ হাজার পদাতিক, ৪ হাজার অশ্বারোহী, তিন শত যুদ্ধ-রথ ও দুই শত রণ-হস্তী ছিল। ঝিলাম নদীর উভয় তীরে গ্রীক বাহিনী ও পুরুর বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হয়। আলেকজাণ্ডার পুরুর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে ভরসা পাইলেন না। তিনি মধ্যরাত্রে নদী পার হইয়া অতর্কিতে পুরুর শিবিরের উপর আক্রমণ চালাইলেন। পুরু বীরবিক্রমে আলেকজাণ্ডারকে বাধা প্রধান করিলেন। কিন্তু অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও পুরু পরাজিত এবং বন্দী হইলেন। বন্দী অবস্থায় পুরুকে আলেকজাণ্ডারের নিকট আনা হইল। আলেকজাণ্ডার পুরুকে প্রশ্ন করিলেন যে তিনি তাঁহার নিকট কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা করেন। নির্ভয়ে পুরু উত্তর দিলেন যে, তিনি রাজার নিকট রাজার আচরণ আশা করেন। এই উত্তরে আলেকজাণ্ডার সন্তুষ্ট হইয়া পুরুর সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন এবং তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে ফিরাইয়া দেন। এই যুদ্ধ ইতিহাসে হিদাস্পিসের যুদ্ধ নামে খ্যাত।

গ্রীকদের সহিত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের যুদ্ধ

খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে ব্যাবিলনে গ্রীকরাজ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ প্রচারিত হইলে ভারতে গ্রীকবিজিত অঞ্চলে দারুণ অশান্তি শুরু হয়। ভারতে আলেকজাণ্ডারের অধিকৃত রাজ্য লাভের জন্য গ্রীক সেনাপতি ও শাসনকর্তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হয়। সেই সময় মগধের রাজা ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। তিনি ভারতে গ্রীক-বিজিত অঞ্চলে বিশৃঙ্খলার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন এবং ভারত হইতে গ্রীক শাসনের অবসানের ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। চন্দ্রগুপ্তের প্রথম পরিকল্পনা ছিল গ্রীক-শাসিত অঞ্চল হইতে গ্রীক সেনাপতি ও গ্রীক শাসনকর্তাদের বিতাড়ন। এই উদ্দেশ্য সফলের জন্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বিভিন্ন স্থান হইতে সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। আনুমানিক ৩২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশকে গ্রীক-অধীনতা হইতে মুক্ত করেন।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতি সেলিউকস পশ্চিম

এশিয়ায় গ্রীক রাজ্যাংশের অধিপতি হইয়াছিলেন। ভারতে গ্রীক-অধিকৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করার উদ্দেশ্যে সেলিউকস ভারতের দিকে অগ্রসর হন (খ্রীঃ পূঃ ৩০৫ অথবা ৩০৪ অব্দ)। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এক বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া সেলিউকসের সম্মুখীন হন। উভয় পক্ষে এক তুমুল যুদ্ধ হয়। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এই যুদ্ধের জয়-পরাজয় সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। কিন্তু জানা যায়, সেলিউকস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সহিত অপমানজনক শর্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সন্ধির শর্ত অনুসারে সেলিউকস কাবুল, কান্দাহার হিরাট ও মাকরাণ মৌর্য-সম্রাটকে সমর্পণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সহিত মিত্রতা সুদৃঢ় করার জন্য গ্রীকরাজ সেলিউকস চন্দ্রগুপ্তের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। মৈত্রীর নিদর্শনস্বরূপ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সেলিউকসকে পাঁচ শত রণ-হস্তী উপহার দেন। সেলিউকস মেগাস্থিনিস নামক জনৈক গ্রীক রাজকর্মচারীকে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন।

সেলিউকসের সহিত চন্দ্রগুপ্তের যুদ্ধ

সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্য সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। সেই সুযোগে একাধিক বৈদেশিক জাতি ভারত আক্রমণ করে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে তাহাদের প্রভুত্ব স্থাপন করে। এই জাতিগুলির মধ্যে ব্যাক্ট্রিয় গ্রীক, শক পহ্লব ও কুষাণগণ ছিল সর্বাধিক উল্লেযোগ্য। ইহারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ভিতর দিয়া ভারতে প্রবেশ করে। শকগণ সিন্ধু-উপত্যকা ও পশ্চিম ভারতে একাধিক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। শক রাজগণ **ক্ষত্রপ** নামে পরিচিত ছিলেন। পশ্চিম ভারতের শক রাজগণ **ক্ষহরত** নামে পরিচিত ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের শক রাজগণ **কর্দমক** নামে পরিচিত ছিলেন। ক্ষহরত শাখার শ্রেষ্ঠ শকরাজ ছিলেন **নহপান**। ব্রোচ, কাথিয়াবাড়, আজমীঢ়, পুস্করা প্রভৃতি অঞ্চল নহপানের রাজ্যভুক্ত ছিল।

শকদের বিরুদ্ধে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর প্রতিরোধ

শকগণ পশ্চিম ভারতে যখন রাজ্যবিস্তার করিতেছিল সেই সময় দক্ষিণ ভারত ও মহারাষ্ট্রের কিছু অংশে সাতবাহন রাজবংশ রাজত্ব

করিতেছিল। ফলে শকদের সহিত সাতবাহন রাজগণের সংঘর্ষ ও যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে। সাতবাহন রাজগণের মধ্যে **গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী** (খ্রীঃ ৭০-৯৫ অব্দ) এই বিষয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেন। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর সমসাময়িক শকরাজ ছিলেন নহপান। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীকে শক, যবন ও পহ্লবদের নিধনকারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার সর্বাধিক কৃতিত্ব হইল শকদের ক্ষহরত বংশের উচ্ছেদ সাধন। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর সিংহাসন আরোহণের অষ্টাদশ বৎসর পরে শকরাজ নহপানের সহিত তাঁহার যুদ্ধ শুরু হয়। গৌতমীপুত্র একে একে **অপরান্ত, অনুপ, সৌরাষ্ট্র, অবন্তী** প্রভৃতি অঞ্চল হইতে শকদের বিতাড়িত করেন। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর জীবিতকাল পর্যন্ত পশ্চিম ভারতে শকগণ হীনবল হইয়া পড়িতে থাকে। বিজিত অঞ্চলগুলির উপর প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী দক্ষিণ ভারতের কর্দমক বংশের রাজা রুদ্রদমণের কন্যার সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দেন। কিন্তু গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর মৃত্যুর পর তাঁহার বিজিত শকরাজ্যের অধিকাংশই শকরাজ রুদ্রদমণ পুনরুদ্ধার করেন।

শক ও কুষাণদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সংগ্রাম

গুপ্তসম্রাটদের সহিতও শক ও কুষাণদের সংগ্রাম চলিতে থাকে। এই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন **দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত**। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন পরাক্রান্ত যোদ্ধা। ভারত হইতে বৈদেশিক শাসনের উচ্ছেদ করা তাঁহার জীবনের মহান ব্রত ছিল। এই সময় শকরাজ দ্বিতীয় রুদ্রসেনের নেতৃত্বে শকগণ পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার ফলে গুপ্তসাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রথমে পশ্চিম ভারতের গুজরাট ও সৌরাষ্ট্রের শকরাজ তৃতীয় রুদ্রসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। সেই সময় শকরাজ্যে গোলযোগ চলিতেছিল। জনৈক শক কর্মচারী শ্রীধরবর্মণ শকরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া মালবে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। শকরাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলেও গোলযোগ চলিতেছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সেই সুযোগে শকরাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তিনি পূর্ব-মালবে

শিবির স্থাপন করেন। সাঁচী ও উদয়গিরির শিলালিপি হইতে জানা যায়, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পূর্ব-মালবে তাঁহার বিরাট সৈন্যবাহিনী, মন্ত্রিবর্গ, সেনাপতি ও করদ-মিত্র রাজগণকে সমবেত করিয়া শক রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে পশ্চিম ভারতে শক-শক্তি বিধ্বস্ত করিতে প্রায় কুড়ি বৎসর সময় লাগিয়াছিল। তৃতীয় রুদ্রসেনের পর তাঁহার উত্তরাধিকারী সিংহসেনের সঙ্গেও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের যুদ্ধ চলিয়াছিল। সিংহসেন পরাজিত হইলে পশ্চিম ভারতে শক-শাসনের অবসান ঘটে। ইহার ফলে পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত গুপ্তসাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে। শক-শাসনের উচ্ছেদসাধন করিয়া দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'শকারি' উপাধি গ্রহণ করেন।

কুষাণদের দমন

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত আফগানিস্তানের কুষাণদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি বহ্লিকদেশ জয় করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কুষাণদের বিদ্রোহ দমন করাই ছিল গুপ্তসম্রাটদের উদ্দেশ্য। সামরিক দিক দিয়া তিনি সাফল্য অর্জন করিলেও তাঁহার এই অভিযানের ফলাফল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।

হূণদের বিরুদ্ধে স্কন্দগুপ্তের সংগ্রাম

শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি জাতিগুলির ন্যায় হূণগণ ছিল মধ্য-এশিয়ার এক বর্বর যাযাবর জাতি। হূণদের একটি শাখা ইওরোপে প্রবেশ করিয়া রোমসাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করে। ইহাদের অপর একটি শাখা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে পারস্য আক্রমণ করে। পারস্যের পর শুরু হয় হূণদের ভারত আক্রমণ। সেই সময় গুপ্তসম্রাট ছিলেন **স্কন্দগুপ্ত**। সিংহাসন আরোহণের অল্পকালের মধ্যেই স্কন্দগুপ্তকে হূণদের আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হয়। **ভিতরী স্তম্ভলিপি**-তে হূণদের সহিত স্কন্দগুপ্তের যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়। উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তে প্রবল হূণ-আক্রমণের ফলে গুপ্তসাম্রাজ্য বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু স্কন্দগুপ্ত এই আক্রমণ প্রতিহত করিয়া গুপ্তসাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করিতে সমর্থ

হন। সোমদেব কর্তৃক রচিত **কথাসরিৎসাগর** নামক গ্রন্থে ম্লেচ্ছদের (অর্থাৎ হূণদের) বিরুদ্ধে স্কন্দগুপ্তের জয়লাভের উল্লেখ আছে। হূণদের বিরুদ্ধে স্কন্দগুপ্তের জয়লাভ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহার ফলে শুধু যে গুপ্তসাম্রাজ্য রক্ষা পাইয়াছিল এমন নহে, সমগ্র ভারত ভয়ানক বিপর্যয় হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। স্কন্দগুপ্তের হূণ-যুদ্ধকে **ধর্মবিজয়** নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কারণ তিনি পরাজিত শত্রুর প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া উহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হূণদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়া স্কন্দগুপ্ত **বিক্রমাদিত্য** উপাধি ধারণ করেন।

হূণদের বিরুদ্ধে যশোধর্মণের সংগ্রাম

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের সময় **যশোধর্মণ** নামে এক অসাধারণ সমরনায়ক মালবে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল মান্দাসোর। গুপ্তসম্রাট স্কন্দগুপ্ত হূণদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উহাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর **মিহিরকুলের** নেতৃত্বে হূণগণ পুনরায় প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ৫৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ মান্দাসোর লিপিতে যশোধর্মণের সহিত হূণদের সংগ্রামের বিবরণ আছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, যশোধর্মণ হূণনেতা মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ যশোধর্মণকে 'শক-বিজেতা' বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্য নহে। হূণদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি পরাক্রান্ত নরপতি রূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

সিন্ধুদেশে আরবদের অভিযান ও রাজা দাহিরের প্রতিরোধ

ম্যাসিডনের রাজা আলেকজাণ্ডারের সময় হইতে যুগে যুগে মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন যাযাবর জাতি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ভিতর দিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। উহারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজ্য স্থাপনও করিয়াছিল। কিন্তু খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এক নূতন জাতি সংঘবদ্ধভাবে সমুদ্রপথ বাহিয়া ভারতের সিন্ধুদেশ আক্রমণ করে। ইহারা হইল ইসলামধর্মী আরবগণ। নূতন ধর্মের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া আরববাসী **মহম্মদের মৃত্যুর** কয়েক বৎসরের মধ্যে সিরিয়া

প্যালেস্টাইন, মিশর, পারস্য প্রভৃতি অঞ্চল জয় করে। পারস্য প্রভৃতি রাজ্যগুলি জয়ের পর আরবদের দৃষ্টি ভারতের উপর পড়ে। ৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভারতের পশ্চিম-সীমান্তে আরবদের নৌ-অভিযান শুরু হয়। ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুদেশের **দেবল বন্দর** অধিকারের উদ্দেশ্যে আরবদের একটি অভিযান প্রেরিত হয়। কিন্তু সেই অভিযান ব্যর্থ হয়।

অষ্টম শতাব্দীর প্রথমদিকে পুনরায় আরবদের সিন্ধু-অভিযান শুরু হয়। সেই সময় ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী **হেজ্জাজ-বিন-ইউসুফ** এবং সিন্ধুদেশের অধিপতি ছিলেন রাজা **দাহির**। দাহিরের রাজ্য পূর্বে কাশ্মীর, পশ্চিমে মাকরাণ, দক্ষিণে সমুদ্রোপকূল ও উত্তরে কিকানন পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দেবল ছিল সিন্ধুরাজ্যের প্রধান বন্দর। প্রথমদিকে সিন্ধুরাজ্য খুবই শক্তিশালী ছিল। কিন্তু সপ্তম শতাব্দী হইতে রাজ্যের শক্তি ও সংহতি ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সামান্য একটি ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া আরবদের সিন্ধুদেশ অভিযান শুরু হয়। ৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহল হইতে কয়েকটি জাহাজপূর্ণ মুসলিম তীর্থযাত্রী ও সেই সঙ্গে ইরাকের হেজ্জাজের নিকট প্রেরিত কিছু সামগ্রী আরব দেশে ফিরিয়া যাইতেছিল। পথে সিন্ধুদেশের অন্তর্গত দেবল বন্দরের নিকট জাহাজগুলি জলদস্যুগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ইরাকের হেজ্জাজ সিন্ধুরাজ দাহিরের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। দাহির জলদস্যুতার জন্য নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করেন এবং সেই কারণে ক্ষতিপূরণ প্রদানেও অস্বীকৃত হন। ফলে তাঁহার বিরুদ্ধে আরবদের অভিযান শুরু হয়।

আরব অভিযানের উপলক্ষ্য

আরবদের দুইটি অভিযান পরপর প্রেরিত হয়। রাজা দাহিরের পুত্র **জয়সিংহ** জলযুদ্ধে আরবদের অভিযান দুইটি ব্যর্থ করেন। ইরাকের হেজ্জাজ মহম্মদ-বিন-কাশিমের নেতৃত্বে সিন্ধুদেশের বিরুদ্ধে আর একটি শক্তিশালী অভিযান প্রেরণ করেন। ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে **মহম্মদ-বিন-কাশিম** সিন্ধু-অভিযানে অগ্রসর হন। পরবৎসর তিনি দেবলের সন্নিকটে

মহম্মদ-বিন-কাশিমের অভিযান

আসিয়া উপস্থিত হন এবং সতের বৎসরের অধিক বয়স্ক পুরুষ মাত্রকেই নির্বিচারে হত্যা করেন। আরবগণ সিন্ধুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নগরের পর নগর দখল করে কিন্তু রাজা দাহির তখনও পর্যন্ত শত্রুর আক্রমণের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই অথবা সিন্ধু-সরকারের গুপ্তচর বিভাগের অপদার্থতার জন্য দাহির শত্রুর অগ্রগতির সংবাদ জ্ঞাত ছিলেন না। যাহা হউক, রাজধানীতে নিষ্ক্রিয় থাকিয়া রাজা দাহির মারাত্মক ভুল করেন। ইহার ফলে আরব আক্রমণকারীগণ বিনা বাধায় সিন্ধুদেশের দক্ষিণাঞ্চলের অনেক স্থান দখল করে। তিনি শত্রুর অগ্রগতির পথে বাধা প্রদানের কোন চেষ্টাই করিলেন না। মহম্মদ-বিন-কাশিম পঁচিশ হাজার সৈন্য লইয়া দেবল অবরোধ করেন। দেবলের হিন্দু সৈন্যগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও পরাস্ত হইল এবং দেবল আরবদের হস্তগত হইল। কয়েক দিন ধরিয়া দেবলে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চলিল। আরবগণ দেবলের মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া মসজিদ নির্মাণ করিল এবং দেবলের বহু নাগরিককে বলপূর্বক ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত করিল। এইভাবে ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ শহর ও বন্দর আরবদের হস্তগত হইল।

দেবলের শাসনভার এক আরব শাসনকর্তার হস্তে অর্পণ করিয়া মহম্মদ-বিন-কাশিম **নিরুণের** দিকে অগ্রসর হইলেন। ৭১২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে আরবগণ বিনা বাধায় নিরুণ দখল করিল। আরবদের ক্রমাগত সাফল্যের সংবাদে **রাজা দাহির** সক্রিয় হইয়া উঠিলেন। তিনি অল্পসময়ের মধ্যে প্রায় ৫০ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আরবদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। আরবদের সহিত দাহিরের এক প্রচণ্ড সংগ্রাম হইল। দাহির স্বয়ং হস্তীর পৃষ্ঠে চড়িয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিলেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে তিনি যথেষ্ট সামরিক দক্ষতার পরিচয় দিলেন। কিন্তু দাহিরের হস্তী আরবদের দ্বারা তীরবিদ্ধ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। ইহার ফলে সিন্ধুর সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে দাহির পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রচণ্ড আক্রমণ

দাহিরের যুদ্ধযাত্রা

উভয় পক্ষে এক তুমুল যুদ্ধ হয়। মামুদের অশ্ববাহিনী জয়পালের হস্তীবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও জয়পাল পরাস্ত হন এবং পুত্র, পৌত্র ও অনুচর সহ বন্দী হন। শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া জয়পালকে মামুদের সম্মুখে আনা হয়। জয়পালের অঙ্গের সমুদয় অলংকারাদি কাড়িয়া লওয়া হয় এবং তাঁহার প্রচুর ধনসম্পদ লুণ্ঠন করা হয়। পরে জয়পাল প্রচুর অর্থ ও রাজ্যের কিছু অংশ প্রদান করিয়া মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু জয়পাল এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয়পুত্র **আনন্দপালের** হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া আত্মহত্যা করেন (১০০২ খ্রীঃ)। জয়পালের পরাজয় ও তাঁহার আত্মহত্যা শাহী-বংশের অনুগামীদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করে এবং অপরদিকে তুর্কীগণকে রাজ্যজয়ে উৎসাহিত করে।

ইহার পর আনন্দপালের সহিত মামুদের সংগ্রাম শুরু হয়। মামুদ মুলতানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং আনন্দপালের রাজ্যের ভিতর দিয়া সসৈন্যে যাইবার প্রস্তাব করেন। আনন্দপাল এই প্রস্তাবে অসম্মত হন। তিনি মুলতানের অধিপতি দাউদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পেশোয়ার অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু আনন্দপাল মামুদের নিকট পরাজিত হন। মামুদ মুলতান অধিকার করেন। দাউদকে সাহায্য করার অপরাধে মামুদ আনন্দপালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন।

মামুদের সহিত আনন্দপালের সংগ্রাম

আনন্দপাল গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর, আজমীঢ়, দিল্লী, কনৌজ প্রভৃতি রাজ্যের নৃপতিদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। অল্প সময়ের মধ্যে ভারতীয় নৃপতিদের সৈন্যবাহিনী আনন্দপালের সহিত যোগদান করিল। এইভাবে এক বিশাল সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া আনন্দপাল মামুদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। পাঞ্জাবের খোকর জাতিও আনন্দপালের সাহায্যে অগ্রসর হয়। পেশোয়ারের সন্নিকটে উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় (১০০৯ খ্রীঃ)। হিন্দুবাহিনীর জয় যখন সুনিশ্চিত, সেই সময় আনন্দপালের হস্তী ভীত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া যায়। ইহাতে হিন্দু সৈন্যগণ বিভ্রান্ত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। মামুদ হিন্দু

সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বহু শত্রু নিহত করেন। আনন্দপালের প্রচুর ধনরত্ন মামুদের হস্তগত হয়।

এই যুদ্ধের ফলে শাহীরাজ্যের বহু অঞ্চল মামুদের হস্তগত হয়। কিন্তু পরাজয় আনন্দপালকে হতাশ করিতে পারিল না। তাঁহার মনোবল আরও কঠোর হইল এবং তিনি শত্রুকে বাধা প্রদান করিতে আরও দৃঢ়সংকল্প হইলেন। তিনি পূর্ব-পাঞ্জাবে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। পূর্ব-পাঞ্জাবে প্রতিরোধ-ব্যবস্থা শক্তিশালী করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু মামুদের সহিত পুনরায় সংগ্রামে লিপ্ত হইবার পূর্বেই আনন্দপালের মৃত্যু হয়।

গজনীর সুলতান মামুদের পর ভারতে পরবর্তী তুর্কী-অভিযানের নায়ক ছিলেন ঘোরী বংশীয় সুলতান **মহম্মদ-বিন-ঘোরী**। মহম্মদ ঘোরী ভারতে রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্য লইয়াই ভারত-অভিযানে বাহির হন। সেই সময় উত্তর ভারতে একাধিক স্বাধীন হিন্দু রাজ্য ছিল। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল **দিল্লী ও আজমীঢ়ের চৌহানবংশ, কনৌজের রাঠোর বংশ, বুন্দেলখণ্ডের চান্দেলগণ** এবং **বাংলা ও বিহারের সেনবংশ**। ইহাদের মধ্যে রাজপুত চৌহানবংশ ছিল সর্বাধিক শক্তিশালী।

মহম্মদ ঘোরীর বিরুদ্ধে পৃথ্বীরাজের সংগ্রাম

গজনীবংশের পতন হইলে চৌহান রাজগণ পাঞ্জাবের কিছু অংশ দখল করেন। মহম্মদ ঘোরীর সমসাময়িক চৌহান রাজা ছিলেন **পৃথ্বীরাজ**। তিনি ছিলেন বীর যোদ্ধা ও তাঁহার স্বদেশপ্রেম ছিল মহান। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তুর্কীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার প্রধান দায়িত্ব তাঁহারই উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। পৃথ্বীরাজ সীমান্তে প্রতিরোধ-ব্যবস্থা শক্তিশালী করিয়া তোলেন, যাহাতে তুর্কীরা পাঞ্জাবে প্রবেশ করিতে না পারে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পৃথ্বীরাজের সর্বশেষ শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল ভাতিন্দা। মহম্মদ ঘোরী ভারত অভিযানে বাহির হইয়া প্রথমেই **ভাতিন্দার দুর্গ** আক্রমণ করেন (১১৮৯ খ্রীঃ)। এই অতর্কিত

পৃথ্বীরাজের প্রতিরোধ ব্যবস্থা

চালাইয়া বহু আরব সৈন্য হতাহত করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ শত্রুর দ্বারা হঠাৎ তীরবিদ্ধ হইয়া হস্তীপৃষ্ঠ হইতে তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। যাহা হউক শীঘ্রই তিনি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও দাহির পরাজিত হইলেন ও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার পর মহম্মদ-বিন-কাশিম **রাওয়ার দুর্গ** অবরোধ করিলেন। দাহির-পত্নী **রাণীবাঈ** ও তাঁহার পুত্র **জয়সিংহ** বীরবিক্রমে আরবদের বাধা প্রদান করিলেন। শেষে জয়লাভের কোন আশা না দেখিয়া রাণীবাঈ নিজ-পরিচারিকা সহ অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। হিন্দু সামন্তগণের বিশ্বাসঘাতকতায় জয়সিংহের পরাজয় ঘটিল। ফলে সমগ্র সিন্ধুদেশ আরবদের হস্তগত হইল এবং তথায় আরব-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল।

দাহিরের পরাজয়, আরবদের সিন্ধু-বিজয়

ইসলামধর্মীদের মধ্যে আরবগণই সর্বপ্রথম ভারত আক্রমণ করে এবং সিন্ধুদেশে উহাদের প্রভুত্ব স্থাপন করে। এই ঘটনার বহুকাল পরে ইসলামধর্মী তুর্কীরা ভারত অভিযানে বাহির হয়। তুর্কীদের নেতা ছিলেন গজনীবংশের দুই সুলতান—**সবুক্তগীন** ও তাঁহার পুত্র **সুলতান মামুদ**। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আফগানিস্তানে গজনীবংশের উত্থান ঘটে। সেই সময় ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে শাহী-রাজবংশ রাজত্ব করিতেছিল।

গজনীর সুলতানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

সবুক্তগীন ছিলেন শক্তিশালী ও উচ্চাভিলাষী পুরুষ। তিনি ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। তিনি আফগান জাতিকে সংঘবদ্ধ করিয়া লামঘান ও সিস্তান জয় করেন। কিন্তু সবুক্তগীনের ভারত আক্রমণের প্রথম ও প্রধান প্রতিবন্ধক ছিলেন পাঞ্জাবের শাহী-বংশের রাজা **জয়পাল**। এই সময় জয়পালের রাজ্য চেনাব নদী হইতে হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কাবুল শাহী-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মৌর্যদের সময় হইতে এই অঞ্চল ভারতের অংশরূপে বিবেচিত হইত। প্রায়

সবুক্তগীনের সহিত জয়পালের সংগ্রাম

তিনশত বৎসর ধরিয়া শাহীরাজগণ আরবদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু গজনীর সুলতানগণ শাহীরাজ্য ধ্বংস করিয়া ভারতে প্রবেশ করিবার পথ উন্মুক্ত করিতে দৃঢ়সংকল্প হন। সবুক্তগীন শাহী-রাজ্যের সীমান্তে ক্রমাগত আক্রমণ চালাইতে থাকেন। শাহী-বংশীয় রাজা জয়পাল নিজের বিপদ সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠেন। নূতন গজনী রাজ্যকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে জয়পাল এক বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া ৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গজনী অভিমুখে যাত্রা করেন। সবুক্তগীনও তাঁহার সৈন্যবাহিনী লইয়া জয়পালের সম্মুখীন হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এক প্রবল ঝড়ের ফলে জয়পালের সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় জয়পাল সন্ধি প্রার্থনা করিতে বাধ্য হন। তিনি সবুক্তগীনকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ, পঞ্চাশটি হস্তী ও রাজ্যের কিছু অংশ ছাড়িয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন। জয়পাল নিজরাজ্যে ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহার সঙ্গে আসেন সবুক্তগীনের দুইজন দূত। কিন্তু নিজরাজ্যে ফিরিয়া আসিয়াই জয়পাল সন্ধির শর্ত পালন করিতে অসম্মত হন এবং সবুক্তগীনের দূতকে বন্দী করেন। সন্ধিভঙ্গের অপরাধে সবুক্তগীন পুনরায় জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করেন। জয়পাল দিল্লী, আজমীঢ়, কালিঞ্জর প্রভৃতি রাজ্যের রাজাদের সাহায্য লইয়া দ্বিতীয়বার গজনী অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু পুনরায় জয়পাল পরাজিত হন। সবুক্তগীন পেশোয়ার দখল করেন এবং তথায় এক মুসলমান শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সবুক্তগীন ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তিনি তুর্কীদের ভবিষ্যৎ ভারত অভিযানের পথ সুগম করেন।

জয়পালের দুইবার পরাজয়

সবুক্তগীনের মৃত্যুর পর (৯৯৭ খ্রীঃ) তাঁহার পুত্র **সুলতান মামুদ** গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান মামুদও ভারত সম্পর্কে পিতার অনুসৃত রাজ্যবিস্তার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী ও যুদ্ধপ্রিয়। ১০০১ খ্রীষ্টাব্দে দশ হাজার সৈন্য লইয়া মামুদ জয়পালের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। পেশোয়ারের নিকট

আক্রমণের জন্য পৃথ্বীরাজ প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে ভাতিন্দা দুর্গের পতন হয় এবং মহম্মদ ঘোরী তাহা সহজেই দখল করেন। এই দুর্গ পুনর্দখলের জন্য পৃথ্বীরাজ সসৈন্যে অগ্রসর হন। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় দুই লক্ষ অশ্বারোহী ও ত্রিশ হাজার হস্তী। পৃথ্বীরাজ ভাতিন্দা দুর্গের সন্নিকটে আসিয়া পৌঁছিলে মহম্মদ ঘোরী তাঁহার সম্মুখীন হন। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে **তরাইনের** রণক্ষেত্রে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। পৃথ্বীরাজ বীরবিক্রমে তুর্কীবাহিনী আক্রমণ করেন। পৃথ্বীরাজের অশ্ববাহিনীর ক্ষিপ্রতা ও তাঁহার সামরিক দক্ষতার ফলে মহম্মদ ঘোরীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। মহম্মদ ঘোরী নিজেও আঘাত পান। তিনি কোনক্রমে পলায়ন করিতে সমর্থ হন। এই যুদ্ধ **তরাইনের প্রথম** যুদ্ধ নামে খ্যাত। পৃথ্বীরাজ ভাতিন্দার দুর্গ অবরোধ করেন এবং কয়েক মাস পরে তাহা পুনরুদ্ধার করেন।

প্রথম তরাইনের যুদ্ধ : মহম্মদ-ঘোরীর পরাজয়

মহম্মদ ঘোরী এই পরাজয়ের ও অপমানের গ্লানি ভুলিতে পারেন নাই। পরাজয়ের গ্লানি দূর করার উদ্দেশ্যে তিনি পুনরায় প্রস্তুতি শুরু করেন। প্রস্তুতিপর্ব শেষ হইলে তিনি পুনরায় ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় দেড় লক্ষ অশ্বারোহী। লাহোরে উপনীত হইয়া তিনি পৃথ্বীরাজের নিকট দূত পাঠাইয়া তাঁহার আত্মসমর্পণের দাবি করেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজ ঘৃণাভরে এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ভাতিন্দার দিকে অগ্রসর হন এবং ভারতের অন্যান্য রাজপুত নৃপতিদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। কনৌজের রাজা **জয়চাঁদ** ছাড়া অনেক রাজপুত নৃপতি পৃথ্বীরাজের সাহায্যে অগ্রসর হন। পুনরায় তরাইনের রণক্ষেত্রে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয় (১১৯২ খ্রীষ্টাব্দ)। মহম্মদ ঘোরীর সামরিক দক্ষতা ও তাঁহার অশ্ববাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে হিন্দুবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। পৃথ্বীরাজের প্রধান সেনাপতি **খাণ্ডেরাই** নিহত হইলে পৃথ্বীরাজ হতাশ হইয়া পড়েন এবং তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে

মহম্মদ ঘোরীর পুনরায় আক্রমণ : তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ

পলায়ন করেন। মহম্মদ ঘোরী আশাতীত সাফল্য লাভ করেন। এই যুদ্ধ **তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ** নামে খ্যাত। পরে পৃথ্বীরাজ বন্দী হন। এই যুদ্ধের ফলে চৌহানদের সামরিক শক্তির বিপর্যয় ঘটে এবং মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণের পথ উন্মুক্ত হয়।

অনুশীলনী

১। আলেকজাণ্ডারের সহিত পুরুর সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

২। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কিভাবে ভারত হইতে গ্রীক শাসনের অবসান ঘটাইয়াছিলেন ?

৩। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী কে ছিলেন ? শকদের সহিত তাঁহার সংগ্রাম সম্বন্ধে কি জান ?

৪। শক ও কুষাণদের সহিত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। হূণদের সহিত স্কন্দগুপ্ত কিরূপ সংগ্রাম করিয়াছিলেন ?

৬। আরবদের সিন্ধুদেশ অভিযান সম্বন্ধে কি জান ?

৭। রাজা দাহির কে ছিলেন ? আরবদের সহিত তাঁহার সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৮। সবুক্তগীন ও সুলতান মামুদ কে ছিলেন ? তাঁহাদের সহিত জয়পালের সংগ্রাম কিরূপ হইয়াছিল ?

৯। আনন্দপাল কে ছিলেন ? তাঁহার সহিত সুলতান মামুদের সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১০। পৃথ্বীরাজ কে ছিলেন ? তিনি মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণ কিভাবে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করিয়াছিলেন ?

১১। প্রথম ও দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধের বর্ণনা দাও।

চতুর্থ অধ্যায়

পাল ও সেনযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি

পালযুগ

সমাজ ও সংস্কৃতি ঃ বাংলার সামাজিক বিবর্তন ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পালযুগ এক গৌরবময় যুগ। পালযুগে বাংলার সমাজে বিভিন্ন বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়—যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই যুগেই করণ-কায়স্থ নামে অপর এক বর্ণের উদ্ভব হয়। এই কয়টি প্রধান বর্ণ ছাড়াও সমাজে কতকগুলি মিশ্রবর্ণেরও উল্লেখ পাওয়া যায়—যথা গন্ধবণিক, মালাকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার, স্বর্ণবণিক, ধীবর, রজক, কংসকার ইত্যাদি। এই মিশ্রবর্ণগুলি সবই শূদ্রজাতীয় এবং উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন সংকর শ্রেণীতে বিভক্ত। করণ ও অম্বষ্ঠ সংকর বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পালযুগে কৈবর্তজাতি রাজ্যে ও সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে। নীচজাতির মধ্যে ডোম, চণ্ডাল ও শবরের উল্লেখ পাওয়া যায়। পালরাজগণ বর্ণাশ্রম-ধর্ম সযত্নে প্রতিপালন করিতেন এবং সমাজের বিধান রক্ষা করিয়া চলিতেন।

বর্ণ ও শ্রেণী

সমাজে ব্রাহ্মণগণ সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিতেন। তাঁহাদের চরিত্র, পাণ্ডিত্য ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা সমাজের আদর্শ ছিল। ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ শাস্ত্রচর্চা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত থাকিতেন। কিন্তু অনেক ব্রাহ্মণ রাজকার্যেও নিযুক্ত ছিলেন, এমন প্রমাণও আছে। ব্রাহ্মণদের পরেই সমাজে করণ-কায়স্থদের প্রভাব খুব বেশী ছিল। তাঁহাদের অধিকাংশই উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা রামপালের রাজবৈদ্য ছিলেন একজন করণ-কায়স্থ।

পালযুগে নীচজাতির লোকেরা যথা—ডোম, চণ্ডাল ও শবর—অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হইত ও তাহারা শহরের বাহিরে বাস করিত। উহাদের প্রধান বৃত্তি ছিল বাঁশের ঝুড়ি তৈয়ারি করা ও তাঁতচালনা

করা। উহাদের স্ত্রী ও কন্যারা নৃত্য-গীত করিয়া অর্থ উপার্জন করিত। শবরেরা সাধারণতঃ পাহাড়ে বাস করিত। সমাজে নারীর যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। নৃত্য-গীতে নারীদের অংশ গ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যায়। নারীদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা ছিল।

পূজা-পার্বণ

সেযুগেও বাংলায় বারো মাসে তেরো পার্বণের প্রচলন ছিল। এই সব পূজা-পার্বণ উপলক্ষ্যে নানা প্রকার আমোদ-উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। বিবাহাদিতে নৃত্য-গীত ও অন্যান্য আমোদ-উৎসব হইত। বর বিবাহ করিতে যাইবার সময় মাদল, দুন্দুভি, কসালা প্রভৃতি নানা প্রকার বাদ্য হইত। সেই যুগেও দুর্গাপূজা বাংলার প্রধান উৎসব ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দী কর্তৃক রচিত রামচরিতে উল্লেখ আছে যে, দুর্গাপূজার সময় বরেন্দ্রভূমিতে বিপুল আনন্দ-উৎসব হইত। বিজয়া-দশমীর দিন **শাবরোৎসব** নামে একপ্রকার নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠান হইত। সেই যুগেও হোলি একটি প্রধান উৎসব ছিল।

খাদ্য ঃ পোশাক-পরিচ্ছদ

সেযুগে বাংলার অধিবাসীদের অধিকাংশই গ্রামে বাস করিত। সন্ধ্যাকর নন্দীর **রামচরিত** নামক গ্রন্থে সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলার বর্ণনা আছে। তাঁহার বর্ণনা হইতে শহরের নাগরিকদের ঐশ্বর্য, রুচি ও বিলাসিতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই যুগে বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, মাছ, শাকসব্জি দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত নানাপ্রকার খাদ্য। নানাপ্রকার মাদক দ্রব্যেরও প্রচলন ছিল। নারী ও পুরুষের মধ্যে অলংকারের প্রচলন ছিল। নর-নারী ধুতি বা শাড়ি পরিত। নারীদের মধ্যে ওড়নারও প্রচলন ছিল।

বৌদ্ধধর্মের প্রসার

পালরাজগণের আমলে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। পালরাজগণ ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁহারা বহু বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সেইগুলির মধ্যে ধর্মপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীলা মহাবিহার সমধিক প্রসিদ্ধ। ভাগীরথী নদীর তীরে এক পাহাড়ের উপর এই বিহারটি অবস্থিত ছিল। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুর নামক স্থানে ধর্মপাল আরও একটি

বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা **সোমপুরী মহাবিহার** নামে পরিচিত। পালযুগে বাংলায় অন্যান্য বৌদ্ধ রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়, যথা—বিক্রমপুরের **চন্দ্র বংশ** এবং হরিকেলের রাজা **কান্তিদেব**।

সেযুগে বৌদ্ধধর্ম চর্চা ও শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল **বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী বিহার ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়**। এইসব শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র ও সংস্কৃত সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা হইত। বিক্রমশীলা ও নালন্দা—এই দুইটি বিখ্যাত বৌদ্ধবিহারে অনেক বাঙ্গালী আচার্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। পালযুগে বৌদ্ধ আচার্যদের মধ্যে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এখনও তিব্বতবাসী তাঁহাকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করেন। রাজা মহীপাল তাঁহাকে বিক্রমশীলা বিহারের প্রধান আচার্যপদে নিযুক্ত করেন। পরে তিনি তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে তিব্বতে গমন করেন এবং **মহাযানধর্ম** প্রচার করেন। এই যুগে বৌদ্ধধর্ম ও শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র ছিল **নালন্দা**। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বিদ্যার্থী ও আচার্যগণ এই শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদান করিতেন। রাষ্ট্র ইঁহাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিত।

ধর্মচর্চা ও শিক্ষার কেন্দ্র

পালরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম প্রতিপত্তি লাভ করিলেও, ইহা ব্রাহ্মণ্যধর্মকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। বৌদ্ধধর্ম জনসাধারণের মধ্যে বেশী প্রচলিত ছিল। কিন্তু পৌরাণিক ধর্ম সাধারণতঃ ধনী, শিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মমত সেযুগে হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। পালযুগের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি। বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ ও হিংসা-দ্বেষ ছিল না। পাল-রাজগণ ধর্মবিষয়ে উদার মনোভাব পোষণ করিতেন। রাজা ধর্মপাল ও বিগ্রহপাল বর্ণাশ্রমধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। রাজা নারায়ণ পাল কর্তৃক শিবমন্দির নির্মাণ ও শৈব রাজা **বৈন্যগুপ্ত** কর্তৃক জৈনবিহারের জন্য ভূমিদান করার উল্লেখ আছে।

অন্যান্য ধর্মমত

ধর্মীয় উদারতা

শিক্ষা ও সাহিত্য

পালযুগে শিক্ষা ও সাহিত্যের বিশেষ বিকাশ ঘটিয়াছিল। এই যুগেই **চর্যাপদ** নামে বৌদ্ধ দোঁহা ও সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল। অনেকের মতে বৌদ্ধ চর্যাপদগুলিই প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন। চর্যাপদগুলির প্রত্যেকটিতে চারি হইতে ছয়টি পদ আছে। **কৃষ্ণপাদ** বা **কাহ্নপা** ছিলেন অনেকগুলি চর্যাপদের রচয়িতা। বৌদ্ধ ধর্মগুরুরা **সিদ্ধাচার্য** নামে পরিচিত ছিলেন। ইঁহারাই চর্যাপদগুলি রচনা করেন।

পালযুগে বাংলায় সংস্কৃত কাব্যচর্চা ও কাব্যরচনা বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল। পালরাজগণের লিখিত যে সকল সংস্কৃত শ্লোক আছে, তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে সেই যুগে বাংলায় সংস্কৃত-সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল। দেবপালের মন্ত্রী দর্ভপাণি চতুর্বেদে পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। সেই যুগের বরেন্দ্রভূমির ব্রাহ্মণগণ শ্রুতি, স্মৃতি, ব্যাকরণ ও কাব্যে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। পালযুগের একখানি মাত্র কাব্যগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ইহা সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত **রামচরিত** কাব্য। এই গ্রন্থের উপসংহারে একটি কবি-প্রশস্তি আছে। এই গ্রন্থে রামপালের নূতন রাজধানী রামাবতীর অপূর্ব বর্ণনা আছে। কাব্যখানির প্রতিটি শ্লোকের দুই রকম অর্থ করা যায়,—একরকমে পাওয়া যায় রাম-সীতার কাহিনী ও অন্যরকমে রামপালের জীবনী। এই যুগে চিকিৎসাশাস্ত্রে যে কয়জন বাঙ্গালী গ্রন্থকার খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে **চক্রপাণি দত্ত** অন্যতম। তিনি **চরক** ও **শুশ্রূতের** টীকা রচনা করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির নাম হইল **চিকিৎসা-সংগ্রহ** ও **দ্রব্যগুণ-সংগ্রহ**।

শিল্পকলা

পালযুগে বাংলার শিল্পকলাও উন্নত ছিল। এই যুগের প্রস্তর ও ধাতু শিল্পের যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায় তাহার বিষয়বস্তু কেবলমাত্র দেবদেবীর মূর্তি। মূর্তি-নির্মাণের উপকরণ ছিল অষ্ট ধাতু ও কষ্টিপাথর। কাষ্ঠনির্মিত মূর্তিও কিছু পাওয়া গিয়াছে। **দেওরা** ও **বাণগড়ের** বিষ্ণুমূর্তি সেই যুগের উচ্চাঙ্গ শিল্পকলার নিদর্শন। সেযুগে চিত্রশিল্পও কিছুটা উন্নত ছিল। সেযুগের

স্থাপত্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইল **বিক্রমশীলা বিহার** এবং **সোমপুরী বিহার**। বিক্রমশীলা বিহারটি গঙ্গাতটে একটি পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রধান মন্দিরটির চারিদিকে ১০৭টি ছোট ছোট মন্দির ছিল। সোমপুরী বিহারের গাত্রে ক্ষোদিত মূর্তিগুলি ভাস্কর্য-শিল্পের উৎকর্ষের পরিচয় দেয়। পালযুগে **ধীমান** ও তাঁহার পুত্র **বিতপাল** ছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী। তাঁহাদের চেষ্টায় বাংলায় একটি শিল্পী-সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছিল।


পালযুগের দেবীমূর্তি

সেনযুগ

সমাজ ও সংস্কৃতি ঃ সেনযুগে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। সেই সঙ্গে হিন্দুসমাজে নানা সংস্কার প্রবর্তিত হয়। সেনরাজগণ পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের আমলে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রায় বিলুপ্তি ঘটে। বৌদ্ধধর্ম সহজিয়া ধর্মরূপে কিছু জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। তবে তাহা সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর জনগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সহজিয়া ধর্মে গুরুর স্থান ছিল সকলের উপরে। সহজিয়া পন্থীগণ বৈদিক ধর্ম ও পৌরাণিক আচার-অনুষ্ঠানের তীব্র বিরোধী ছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে উহারা বিদ্রুপ করিত। সহজিয়া ধর্মমতের আচার্যগণ **সিদ্ধাচার্য** নামে পরিচিত ছিলেন। সেনরাজগণের আমলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই যুগে শৈব ও

ধর্ম ও সমাজ

বৈষ্ণবধর্ম প্রসার লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক যাগযজ্ঞের ও ক্রিয়াকাণ্ডের আধিক্য ঘটে। সেনযুগে বিষ্ণু, শিব, পার্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা শুরু হয় এবং বহু মন্দির নির্মিত হয়। সেনযুগে শিবপূজারও বিশেষ প্রচলন ছিল। সেনরাজগণের তাম্রশাসন মুদ্রায় সদাশিব মূর্তি ক্ষোদিত দেখা যায়।

সেনরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দুসমাজের ধারক ও বাহক ছিলেন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ। সমাজে রাজার পরেই স্থান ছিল ব্রাহ্মণদের। রাষ্ট্রের ও সমাজের সকল ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের প্রবল আধিপত্য ছিল। এই যুগের বর্ণাশ্রম-রীতির পুনরাবির্ভাব ঘটে। ইহার ফলে পূর্বতন যুগের বহু উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণে পতিত হয়। সমাজে ব্রাহ্মণের পরেই কায়স্থ ও বৈদ্য। ইহার পর গন্ধবণিক, তন্তুবায়, ক্ষৌরকার, মালাকার, গোপ উহাদের নয়টি-শাখা বা **নবশাখ** প্রভৃতি বর্ণের স্থান ছিল। অনেকে মনে করেন রাজা বল্লাল সেন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য শ্রেণীর মধ্যে **কৌলীন্য-প্রথার প্রবর্তন** করেন। মনুসংহিতার আদর্শে সমাজ পুনর্গঠনের চেষ্টা এবং স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ভেদ ও প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ সেনযুগেই প্রচলিত হয়। কথিত আছে যে, কৌলীন্য-প্রথা প্রবর্তনের জন্য বল্লাল সেন কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ আনাইয়াছিলেন। কৌলীন্য লাভের জন্য কয়েকটি বিশেষ গুণের প্রয়োজন হইত ; যথা,—সদাচরণ, বিনয়, শিক্ষা, তীর্থ-ভ্রমণ, সদ্বৃত্তি, দান-ধ্যান ইত্যাদি। হিন্দুসমাজকে নূতন করিয়া গঠন করাই বল্লাল সেনের উদ্দেশ্য ছিল। কুলীনদের মধ্যে তিনটি শ্রেণী ছিল, যথা—**কুলীন, শ্রোত্রিও ও বঙ্গজ**। বিবাহাদি ব্যাপারে কুলীনদের কতকগুলি বিশেষ রীতিনীতি মানিয়া চলিতে হইত। বল্লাল সেনের সংস্কারের ফলে সমাজে রক্ষণশীলতা বৃদ্ধি পায়।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজে বর্ণভেদের সৃষ্টি হয়। হিন্দুসমাজ চারিটি প্রধান শ্রেণী বা বর্ণে বিভক্ত হয় যথা,— **ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও বৈশ্য**। ইহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ও

অন্যান্য সামাজিক আচার-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত ছিল। ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত ছিল। সামাজিক বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। প্রায়শ্চিত্তের বিধি প্রবর্তন করার ফলে সমাজে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য আরও বৃদ্ধি পায়। কারণ ব্রাহ্মণগণই প্রায়শ্চিত্ত করাইবার একমাত্র অধিকারী ছিলেন। সেনযুগে সমাজে সতীদাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

পালযুগের ন্যায় সেনযুগেও বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নত ছিল। সেনরাজগণ ছিলেন শিক্ষা ও সাহিত্যের পরম পৃষ্ঠপোষক। বল্লাল সেন নিজেই **দানসাগর** ও **অদ্ভুতসাগর** নামক দুইটি গ্রন্থে হিন্দুদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ও দান-কর্মাদির বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্মণ সেনও ছিলেন একজন সুকবি। তিনি পিতা বল্লাল সেনের নির্দেশে **অদ্ভুতসাগর** গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন। লক্ষ্মণ সেনের রচিত কয়েকটি শ্লোক পাওয়া গিয়াছে। সেনরাজগণের আমলে পুনরায় সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার হয়। সেনযুগকে বাংলার 'সংস্কৃত কাব্যের স্বর্ণযুগ' বলা হইয়া থাকে। সেনরাজগণের চেষ্টায় বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুধর্মের নবজাগরণ ঘটে। বল্লাল সেনের গুরু **অনিরুদ্ধ ভট্ট** **হরিলতা** ও **পিতৃদয়িতা** নামক দুইটি গ্রন্থে হিন্দুধর্মের বিবিধ অনুষ্ঠানের ও নিত্যকর্মের আলোচনা করিয়াছেন। সেই যুগের বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত সেন-রাজগণের রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার **হলায়ুধ** ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত। লক্ষ্মণ সেন তাঁহাকে প্রথমে মহামাত্য ও পরে ধর্মাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার রচিত **ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব** একখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। হলায়ুধের অন্যান্য গ্রন্থ হইল **মীমাংসা-সর্বস্ব, পণ্ডিত-সর্বস্ব, বৈষ্ণব-সর্বস্ব** ইত্যাদি। হলায়ুধের দুই ভ্রাতা **ঈশান** ও **পশুপতি** শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য দৈনিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সেনযুগের অন্যান্য সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে **সর্বানন্দ, শ্রীধর, ধোয়ী, উমাপতিধর** প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। সর্বানন্দ রচিত **টীকা-সর্বস্ব** বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থ। **শ্রীধর**

সদুক্তিকর্ণামৃত নামে সংস্কৃত কবিতা সংগ্রহ রচনা করেন। ধোয়ী রচিত **পবনদূত,** উমাপতিধর রচিত **চন্দ্রচূড়-চরিত** সেই যুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবিদের মধ্যে জয়দেব ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। তাঁহার রচিত **গীতগোবিন্দের পদাবলী** বাংলা-সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। বৈষ্ণবদের নিকট ইহা একখানি ধর্মগ্রন্থ। জয়দেব যে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন তাহা তাঁহার গীতগোবিন্দের রচনা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়।



শ্রীজয়দেব

সেনযুগেও বাংলার শিল্পকলা উন্নত ছিল। এই যুগে বরেন্দ্রভূমির শিল্পী-গোষ্ঠী চূড়ামণি-রাণক **শূলপাণি** প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শূলপাণি ছিলেন বরেন্দ্রভূমির শিল্পী-সংঘের প্রধান। তিনি রাজ্যের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। সেন যুগে আরও কয়েকজন শিল্পীর নাম পাওয়া যায়, যথা,—**তাতট, সূত্রধর বিষ্ণু ভদ্র, তথাগতসার** ইত্যাদি।

শিল্প

অনুশীলনী

১। পালযুগের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা কর।

২। পালযুগে সাহিত্য ও শিল্পকলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। পালযুগে ধর্মীয় উদারতার দৃষ্টান্ত দাও।

৪। সেনযুগের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা কর।

৫। বাংলায় কৌলীন্য-প্রথার প্রবর্তক কে ছিলেন? এই প্রথা সম্বন্ধে কি জান?

৬। সেনযুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৭। সেনযুগের খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও কবিদের সম্বন্ধে কি জান?

পঞ্চম অধ্যায়

দক্ষিণ-ভারত

ভূমিকা ঃ উত্তর ভারতকে কেন্দ্র করিয়াই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছিল। বহু বৈদেশিক জাতি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল এবং উত্তর ভারত বা আর্যাবর্তেই উহাদের বসতি স্থাপন করিয়াছিল। মৌর্যযুগের পূর্বে দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। তবে ইহা সত্য যে আর্যাবর্ত হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবেই দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস গড়িয়া উঠিতে থাকে।

মৌর্য ও মৌর্যোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারত ঃ মৌর্যযুগ হইতে উত্তর ভারতের সহিত দক্ষিণ ভারতের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হইতে থাকে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাম্রাজ্য দাক্ষিণাত্যের তিনেভেলি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অশোকের সাম্রাজ্য মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের যুগে দক্ষিণ ভারতে দুইটি শক্তিশালী রাজ্যের উদ্ভব হয়। একটি কলিঙ্গের (বর্তমান উড়িষ্যা) চেতরাজ্য ও অপরটি সাতবাহন রাজ্য। সমগ্র দাক্ষিণাত্য ছাড়াও মধ্য-ভারতের কিছু অংশ সাতবাহন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দক্ষিণ ভারতে সাতবাহনবংশ প্রায় সাড়ে চারি শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের দাক্ষিণাত্য অভিযানকালে সেই অঞ্চলে দুইটি রাজবংশ সর্বাধিক পরাক্রান্ত ছিল যথা,—বাকাটক ও পল্লব রাজবংশ।

গুপ্তোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারত ঃ গুপ্তযুগের পর দক্ষিণ ভারতে দুইটি রাজবংশ বিশেষ শক্তিশালী ছিল; যথা—কাঞ্চীর পল্লব ও বাতাপীর চালুক্য বংশ। গুপ্তযুগের পর দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস এই দুই রাজবংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনী।

কাঞ্চীর পল্লব বংশ ঃ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে সাতবাহন বংশের পতনের পর, কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত কাঞ্চী নগরকে কেন্দ্র করিয়া পল্লব বংশের অভ্যুদয় ঘটে। পল্লবদের সম্বন্ধে মতভেদ

আছে। কেহ কেহ পল্লবগণকে বাকাটক বংশের শাখা বলিয়া মনে করেন। আবার কাহারও মতে উহারা সাতবাহন বংশের সামন্ত ছিলেন। তামিল ভাষায় পল্লব শব্দের অর্থ হইল দস্যু। যাহা হউক, পল্লবগণ কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে এক শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে।

পল্লবদের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন **শিবস্কন্দ বর্মণ**। সম্ভবতঃ তিনি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই রাজ্যের অধিপতি হন। তিনি ছিলেন পরাক্রান্ত যোদ্ধা। তিনি কৃষ্ণা নদীর উপকূল হইতে বেলারী জেলা পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

শিবস্কন্দ বর্মণ

পল্লব বংশের পরবর্তী রাজা ছিলেন **বিষ্ণুগোপ**। তিনি সমুদ্রগুপ্তের নিকট পরাজিত হন। তিনি সম্ভবতঃ ৩৫০ হইতে ৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ১৬জন পল্লব রাজের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিষ্ণুগোপ

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে **সিংহবিষ্ণু** কাঞ্চীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার আমলে পল্লবদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও গৌরবময় যুগের সূচনা হয়। তিনি চোল, চের ও পাণ্ড্য রাজগণকে পরাজিত করিয়া কাবেরী নদী পর্যন্ত পল্লব রাজ্য বিস্তার করেন। ইহার ফলে তামিলগণের রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপিত হয়। তিনি সিংহলের রাজাকেও পরাজিত করেন। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। **কিরতার্জুনীয়** কাব্যের রচয়িতা ভারবি ছিলেন সিংহবিষ্ণুর সভাকবি। তিনি সাহিত্যের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সিংহবিষ্ণু

সিংহবিষ্ণুর পর তাঁহার পুত্র **প্রথম মহেন্দ্র বর্মণ** কাঞ্চীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথম মহেন্দ্র বর্মণ ৬০০ হইতে ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি **চেত্তাকারী (মন্দির নির্মাতা) উপাধি গ্রহণ করেন।** তিনি প্রথমে জৈন ধর্মাবলম্বী

প্রথম মহেন্দ্র বর্মণ

ছিলেন কিন্তু পরে শৈবধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বহু মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিচিনপল্লীতে পাহাড় কাটিয়া কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি মহেন্দ্রবাদী নগরে **মহেন্দ্র জলাশয়** খনন করেন। মহেন্দ্র বর্মণ বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নিজে সঙ্গীত সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এইজন্য তিনি **বিচিত্র চিত্ত** নামে খ্যাত হন। প্রথম মহেন্দ্র বর্মণ চালুক্যরাজ **দ্বিতীয় পুলকেশীর** নিকট পরাজিত হন। এই সময় হইতে দক্ষিণ ভারতের প্রভূত্ব লইয়া পল্লব ও চালুক্যগণের মধ্যে সংগ্রামের সূত্রপাত হয়।

মহেন্দ্র বর্মণের পুত্র **নরসিংহ বর্মণ** পল্লব বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। তাঁহার আমলেও চালুক্যদের সহিত পল্লবদের সংগ্রাম চলিতে থাকে। তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত করিয়া চালুক্য রাজধানী **বাতাপী** দখল করেন। ইহার ফলে দক্ষিণ ভারতে পল্লবদের একচ্ছত্র প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

নরসিংহ বর্মণ

চালুক্যদের পরাজিত করিয়া নরসিংহ বর্মণ **মহামল্ল** ও **বাতাপীকোণ্ডা** (বাতাপী বিজেতা) উপাধি ধারণ করেন। নরসিংহ বর্মণের রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। হিউয়েন-সাং পল্লব রাজ্যের এক সুন্দর বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, কাঞ্চীর পরিধি ছিল ছয় মাইল। তথায় একশতেরও অধিক বৌদ্ধমঠ ও দশ হাজার বৌদ্ধভিক্ষু বাস করিত। জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন ছিল। কাঞ্চীর **রাজবিহার** মঠে বহু পণ্ডিত ও আচার্যদের সমাগম হইত। নরসিংহ বর্মণ শিল্প ও সাহিত্যের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আমলে মহাবলিপুরম-এর বিখ্যাত রথমন্দিরগুলি নির্মিত হইয়াছিল। নরসিংহ বর্মণ ৬৩০ হইতে ৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

নরসিংহ বর্মণের উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকালে পল্লব বংশের শক্তি ক্রমেই দুর্বল হইতে থাকে। চালুক্যদের ক্রমাগত আক্রমণে পল্লবরাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া যায়। পল্লবরাজ **পরমেশ্বর বর্মণকে** পরাজিত করিয়া

চালুক্যরাজ প্রথম বিক্রমাদিত্য কাঞ্চী দখল করেন। ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে পল্লবরাজ **নন্দি বর্মণ** চালুক্যদের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। অবশেষে চোলরাজ **আদিত্য** পল্লবরাজ অপরাজিত বর্মণকে পরাজিত করিয়া পল্লব রাজ্যের ধ্বংস সাধন করেন (৮৯১ খ্রীঃ)।

পল্লব বংশের পতন

পল্লব বংশের কৃতিত্ব ঃ দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে পল্লব বংশের রাজত্বকাল বিশেষ স্মরণীয়। তাঁহারাই সর্বপ্রথম দক্ষিণ ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারাই তামিল ভাষাভাষীদের রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপন করেন। পল্লবদের রাজত্বকালে কাঞ্চী ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহারা শিল্পের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কাঞ্চীর **কৈলাসনাথের মন্দির** এবং মহাবলিপুরমের রথমন্দির তাঁহাদের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য প্রীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। পল্লব স্থাপত্য ও ভাস্কর্যরীতি পরবর্তীকালে যবদ্বীপ, আনাম, কম্বোজ প্রভৃতি দেশে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

বাতাপীর চালুক্য বংশ ঃ কেহ কেহ চালুক্যগণকে অযোধ্যার চন্দ্রবংশসম্ভূত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে চালুক্যগণ ছিলেন দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন কানাড়ী বংশসম্ভূত। এই বংশের রাজধানী ছিল বাতাপী নগর (বর্তমান বিজাপুর জেলার বাদামী গ্রাম)।

বংশ পরিচয়

৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে **প্রথম পুলকেশী** চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। প্রথম পুলকেশীর পুত্র **কীর্তিবর্মণ** পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি একাধিক রাজ্য জয় করেন। কীর্তিবর্মণের পর তাঁহার পুত্র **মঙ্গলেশ** সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মালবের কলচুরীগণকে পরাস্ত করেন।

প্রথম পুলকেশী
কীর্তি বর্মণ মঙ্গলেশ

চালুক্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন **দ্বিতীয় পুলকেশী**। তিনি ৬১০ হইতে ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন পরাক্রান্ত যোদ্ধা। দক্ষিণে তিনি কদম্ব ও মহীশূরের গঙ্গবংশীয় রাজগণকে

পরাজিত করেন। তিনি গোদাবরীর তীরে অবস্থিত পিষ্ঠপুরম দখল করিয়া স্বীয় ভ্রাতা বিষ্ণুবর্মণকে সেই অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। দ্বিতীয় পুলকেশী মালব ও গুজরাটের রাজন্যবর্গকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। সুদূর দক্ষিণের চের, চোল ও পাণ্ড্য রাজ্যের নৃপতিগণও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। এইভাবে দ্বিতীয় পুলকেশী দক্ষিণ ভারতে একাধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হন। কিন্তু দ্বিতীয় পুলকেশীর প্রতিপত্তি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নাই। ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পল্লবরাজ নরসিংহ বর্মণের নিকট পরাজিত হইয়া নিহত হন।

দ্বিতীয় পুলকেশী

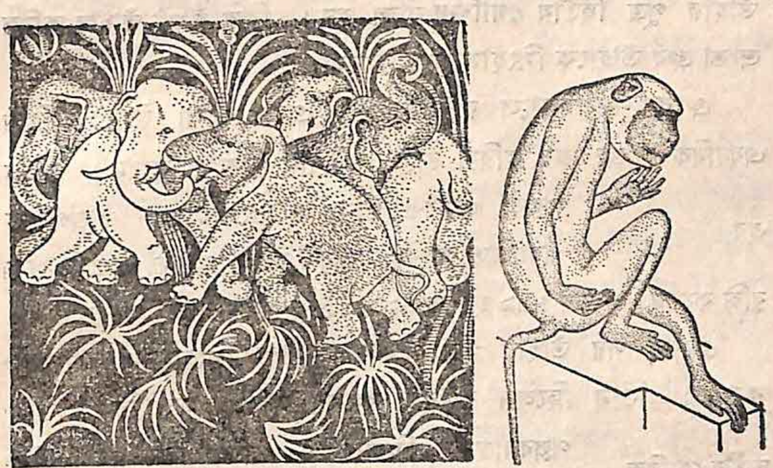
চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্য পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তিনি পুলকেশীর রাজনৈতিক প্রতিপত্তি, সামরিক শক্তি ও তাঁহার রাজ্যের সমৃদ্ধির প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি দ্বিতীয় পুলকেশীকে প্রজাহিতৈষী রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পুলকেশীর পর চালুক্য রাজবংশ দুর্বল হইয়া পড়ে। তাঁহার পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য পল্লবগণকে পরাজিত করিয়া সাময়িকভাবে চালুক্য বংশের লুপ্ত শক্তি পুনরুদ্ধার করেন। প্রথম বিক্রমাদিত্যের পর প্রথম বিনয়াদিত্য ও প্রথম বিজয়াদিত্য যথাক্রমে ৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। বিজয়াদিত্যের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হইল দক্ষিণ ভারতে আরবদের আক্রমণ প্রতিহত করা। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণ রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গের নিকট পরাজিত হইলে চালুক্য বংশের অবসান ঘটে।

চালুক্য বংশের পতন

চালুক্য বংশের কৃতিত্ব ঃ চালুক্যবংশ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সার্বভৌম রাজশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। চালুক্য রাজগণের পরাক্রমেই আরবগণ দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করিতে পারে নাই। চালুক্য রাজগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী হইয়াও অপর ধর্মের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করিতেন। তাঁহারা জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। চালুক্য রাজগণ শিল্পকলার পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভারতের শিল্পতীর্থ অজন্তা চালুক্য রাজ্যেই অবস্থিত ছিল।

অজন্তার বহু গুহা-চিত্র তাঁহাদের আমলেই অঙ্কিত হইয়াছিল। বাদামী



অজন্তার গুহা-চিত্র

ও পটত্তকলের গুহামন্দির এবং অন্যান্য মন্দির চালুক্য স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন।

রাষ্ট্রকূট বংশঃ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে চালুক্য বংশের ধ্বংস সাধন করিয়া রাষ্ট্রকূট বংশ দক্ষিণ ভারতে প্রাধান্য স্থাপন করে।

বংশ পরিচয়

কেহ কেহ রাষ্ট্রকূটগণকে মহাভারতের যদুবংশীয় সাত্যকীরের বংশধর বলিয়া মনে করেন। সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূটগণ দ্রাবিড় জাতির অন্তর্ভুক্ত এক কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ইঁহাদের ভাষা ছিল কানাড়ী।

প্রতিষ্ঠাতা দন্তিদুর্গ

রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন **দন্তিদুর্গ**। তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণের নিকট হইতে মহারাষ্ট্র অঞ্চল দখল করেন। তিনি কলিঙ্গ, কাঞ্চী, মালব প্রভৃতি রাজ্যের নৃপতিগণকেও পরাজিত করেন।

প্রথম কৃষ্ণ

দন্তিদুর্গের পর তাঁহার পিতৃব্য **প্রথম কৃষ্ণ** সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৭৫৮ হইতে ৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। প্রথম কৃষ্ণ কোঙ্কণ প্রদেশ দখল করিয়া মহীশূরের রাজাকে পরাজিত করেন। তাঁহার রাজত্বকালে ইলোরার

বিখ্যাত কৈলাসনাথের মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল। প্রথম কৃষ্ণের পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় **গোবিন্দ** রাজা হন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধ্রুব তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন।

ধ্রুব

ধ্রুবের রাজত্বকালে রাষ্ট্রকূট শক্তি প্রবল হইয়া উঠে। তিনি একাধিক রাজ্য জয় করিয়া রাজ্যের সীমানা বিস্তার করেন। তিনি পল্লব, গুর্জর-প্রতিহার ও বাংলার পাল রাজগণকে পরাজিত করিয়া রাষ্ট্রকূট বংশের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। ধ্রুব ৭৭৯ হইতে ৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

তৃতীয় গোবিন্দ

ধ্রুবের পর তাঁহার পুত্র **তৃতীয় গোবিন্দ** সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রকূট বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি পল্লবরাজ দন্তিবর্মণ ও প্রতিহার রাজ দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাজিত করেন। ইহার পর তিনি বাংলার বিরুদ্ধেও অগ্রসর হন। পালরাজ ধর্মপাল তৃতীয় গোবিন্দের প্রতিপত্তি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তৃতীয় গোবিন্দ ৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

প্রথম অমোঘবর্ষ

তৃতীয় গোবিন্দের পর তাঁহার পুত্র **প্রথম অমোঘবর্ষ** সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বেঙ্গীরাজ্য জয় করেন। তিনি প্রতিহাররাজ ভোজের দক্ষিণ ভারতে আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ করেন। প্রথম অমোঘবর্ষ রাজ্য জয় অপেক্ষা ধর্ম ও সাহিত্যের প্রতি অধিক অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার রচিত **রত্নমালিকা** ও **কবিরাজ মার্গ** সুধীসমাজে প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।

রাষ্ট্রকূট বংশের পতন

অমোঘবর্ষের পরবর্তী রাজা ছিলেন **দ্বিতীয় কৃষ্ণ**। তিনি শাসক বা বিজেতা হিসাবে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। তিনি প্রতিহারগণের নিকট পরাজিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র তৃতীয় ইন্দ্র রাষ্ট্রকূট বংশের গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। তৃতীয় ইন্দ্রের পর দ্বিতীয় অমোঘবর্ষ, চতুর্থ গোবিন্দ ও তৃতীয় অমোঘবর্ষ ৯১৭ হইতে ৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে রাষ্ট্রকূট বংশের পতন শুরু হয়।

একে একে প্রদেশগুলি স্বাধীন হইয়া যায়। অবশেষে ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কল্যাণের চালুক্যরাজ (দ্বিতীয় তৈল) রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কর্ককে পরাজিত করিয়া রাষ্ট্রকূট রাজ্য দখল করেন। এইভাবে রাষ্ট্রকূট বংশের পতন ঘটে।

রাষ্ট্রকূট বংশের কৃতিত্ব ঃ প্রায় দুই শতাব্দীরও অধিককাল রাষ্ট্রকূট বংশ দক্ষিণ ভারতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারত ছাড়াও, উত্তর ভারতের এক বিস্তৃত অংশে রাষ্ট্রকূটগণ প্রভুত্ব স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। উহারা দক্ষিণ ভারত ও উত্তর ভারতের মধ্যে যোগাযোগ সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। এই রাজবংশের আমলে দক্ষিণ ভারতে শিল্প, সাহিত্য ও বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূটগণ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই বংশের নৃপতিগণ বহু মঠ ও মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। এগুলির মধ্যে ইলোরার কৈলাসনাথের মন্দির সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। ইলোরার গুহামন্দিরগুলিও রাষ্ট্রকূট স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

কল্যাণের চালুক্য বংশ ঃ বাতাপীর চালুক্যদের অপর একটি শাখা হইল কল্যাণের চালুক্য বংশ। ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বাতাপীর চালুক্য বংশের দ্বিতীয় **তৈল বা তৈলপ** রাষ্ট্রকূট বংশের শেষ রাজাকে পরাজিত করিয়া এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। হায়দ্রাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত কল্যাণ বা কল্যাণী নগরী ছিল এই রাজ্যের রাজধানী।

প্রতিষ্ঠাতা দ্বিতীয় তৈলপ

তৈলপের পুত্র **সত্যাশ্রয়ের** রাজত্বকালে মালবের পরমার ও চোলগণ চালুক্য রাজ্য আক্রমণ করে। কিন্তু সত্যাশ্রয় বীরত্বের সহিত তাহা প্রতিহত করেন। এই সময় হইতে দক্ষিণ ভারতের প্রভুত্ব লইয়া চালুক্য ও চোলদের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম চলে। **সোমেশ্বর** (১০৪২-৬৮ খ্রীঃ) ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি চোলরাজ রাজরাজকে পরাজিত করিয়া নিহত করেন। সোমেশ্বরের পুত্র **ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য** (১০৭৬-১১২৬ খ্রীঃ) ছিলেন পরাক্রান্ত ও বিদ্যানুরাগী

চালুক্য-চোল সংগ্রাম

নরপতি। তাঁহার সভাকবি ছিলেন বিল্হন। তাঁহার রচিত **বিক্রমাঙ্কদেব চরিত** নামক গ্রন্থে ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সামরিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি চোলরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজধানী দখল করেন।

ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর কল্যাণের চালুক্যবংশের পতন শুরু হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চালুক্য রাজ্য বিভক্ত হইয়া যায় এবং দেবগিরিতে যাদব ও মহীশূরে হয়সল বংশের উদ্ভব হয়।

তাঞ্জোরের চোলবংশ ঃ চোলগণ সুদূর দক্ষিণ ভারতের এক অতি প্রাচীন জাতি। অশোকের শিলালিপিতে স্বাধীন চোলরাজ্যের উল্লেখ আছে। চোলদের প্রথম রাজা ছিলেন **কারিকল**। কালক্রমে পল্লব, চের ও পাণ্ড্য রাজ্যগুলির ক্রমাগত আক্রমণে সাময়িকভাবে চোল রাজ্য ধ্বংস হয়।

বংশ পরিচয়

নবম শতাব্দীতে পল্লব বংশ দুর্বল হইয়া পড়িলে চোলগণ পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠে। **বিজয়ালয়** ছিলেন এই নূতন বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি পাণ্ড্যগণের নিকট হইতে তাঞ্জোর দখল করেন এবং তাঞ্জোর এই রাজ্যের রাজধানী হয়। বিজয়ালয়ের পর তাঁহার পুত্র প্রথম আদিত্য (৮৭১-৯০৭ খ্রীঃ) পল্লবরাজ অপরাজিত বর্মণকে পরাজিত করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠেন। তাঁহার সময় চোলরাজ্য উত্তরে মাদ্রাজ হইতে দক্ষিণে কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বিজয়ালয় ঃ
প্রথম আদিত্য

চোলরাজ **প্রথম রাজরাজ** (৯৮৫-১০১৬ খ্রীঃ) ছিলেন চোলবংশের অপর এক শক্তিশালী নরপতি। তাঁহার নেতৃত্বে চোলগণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। তিনি চের ও পাণ্ড্যগণকে পরাজিত করেন ও সিংহলের উত্তরাঞ্চল দখল করেন। মাদ্রাজ, মহীশূরের কিছু অংশ, কুর্গ ও সিংহলের উত্তরাঞ্চল তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। তাঞ্জোরের বিখ্যাত রাজরাজেশ্বর মন্দির তাঁহার কীর্তি।

প্রথম রাজরাজ

রাজরাজের পুত্র **প্রথম রাজেন্দ্র চোল** (১০১৬-৪৪ খ্রীঃ) ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি বহু রাজ্য জয় করিয়া চোল

সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি সমগ্র সিংহল দ্বীপ দখল করেন।

প্রথম রাজেন্দ্রচোল

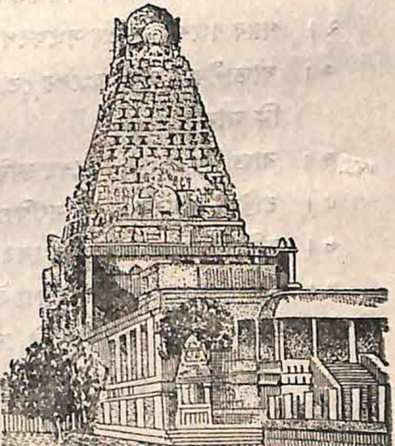
তিনি দক্ষিণ ভারত বিজয় সম্পন্ন করিয়া উত্তর ভারত বিজয়ে অগ্রসর হন। তিনি পূর্ববঙ্গের গোবিন্দচন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গের মহীপাল ও দক্ষিণবঙ্গের রণসূরকে পরাজিত করেন। তাঁহার একটি শক্তিশালী নৌ-বাহিনী ছিল।

রাজেন্দ্র চোলের পর **রাজাধিরাজ, অধিরাজেন্দ্র** ও **কুলোতুঙ্গ** যথাক্রমে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুলোতুঙ্গ (১০৭০-১১২০ খ্রীঃ) চোল ও পূর্ব চালুক্য রাজ্য সংযুক্ত করিয়া চোল-চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন প্রজাহিতৈষী রাজা।

পরবর্তী চালুক্য রাজগণ

চোল বংশের পতন : কুলোতুঙ্গের পর চোল বংশের পতন শুরু হয়। বৈদেশিক আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এই বংশের পতনের অন্যতম কারণ। ইহার পতনের পর পাণ্ড্য ও কেরল রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুরের আক্রমণ ও বিজয়নগর রাজ্যের অভ্যুদয়ের ফলে চোলরাজ্যের অবসান ঘটে।

চোল বংশের কৃতিত্ব : রাজ্য জয় করা ছাড়াও চোলরাজগণ শাসনদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কয়েকটি প্রদেশে চোল সাম্রাজ্য বিভক্ত ছিল। চোল সাম্রাজ্যের শাসন-পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন। কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান গঠিত ছিল। গ্রাম্য সভাগুলি গ্রামের শাসনকার্য



রাজরাজেশ্বরের মন্দির

পরিচালনা করিত। উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাজকররূপে গৃহীত হইত।

চোলরাজগণ ছিলেন শিল্পকলার পরম পৃষ্ঠপোষক। তাঁহাদের আমলে দক্ষিণ ভারতের শিল্পকলা চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। চোলরাজ রাজরাজ নির্মিত **রাজরাজেশ্বর** মন্দিরটি চোল শিল্পকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক স্থাপিত **গঙ্গইকোণ্ড চোলপুরম** নগর, সূক্ষ্ম কারুকার্যশোভিত প্রাসাদ ও নগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত মন্দিরটি চোল স্থাপত্যশিল্প ও ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। চোলযুগের শেষভাগে স্থাপত্যে গোপুরমের (তোরণের) অবতারণা হয়।

অনুশীলনী

১। পল্লব বংশের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।

২। পল্লব বংশের কৃতিত্ব সংক্ষেপে লিখ।

৩। বাতাপীর চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি কে ছিলেন? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান?

৪। বাতাপীর চালুক্য বংশের কৃতিত্ব সংক্ষেপে লিখ।

৫। রাষ্ট্রকূট বংশের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।

৬। দক্ষিণ ভারতে রাষ্ট্রকূট বংশের অবদান কি?

৭। চোল বংশের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।

৮। চোল বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি কে ছিলেন? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান?

৯। চোল বংশের কৃতিত্ব সংক্ষেপে লিখ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

হজরত মহম্মদ ও তাঁহার উপদেশ

ভূমিকা : পৃথিবীর অপর একটি শ্রেষ্ঠ ধর্মের নাম **ইসলাম**। পৃথিবীর বহু দেশে এই ধর্মের অনুগামীগণ বাস করেন। একসময় এশিয়া ও ইওরোপে ইসলাম এক বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ক্রমে ক্রমে তাহা দুর্বল হইয়া পড়ে এবং ইসলামের পূর্ব গৌরব বিনষ্ট হয়। মধ্যযুগে ভারতের তুর্ক-আফগান ও মোগল নৃপতিগণ ছিলেন ইসলাম ধর্মী। খ্রীষ্টজন্মের ছয়শত বৎসর পূর্বে আরব দেশে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। সেই সময় হর্ষবর্ধন ভারতে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ধর্ম যেখানে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, সেই প্যালেস্টাইন হইতে ইসলাম ধর্মের জন্মস্থান আরব দেশ খুব বেশী দূরে নয়। এই কারণে ইসলাম ধর্মের উপর ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন **হজরত মহম্মদ**।

হজরত মহম্মদের পূর্বে আরব দেশ : আরব দেশের অধিকাংশই মরুভূমি। ইহা এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার কোন কোন স্থানে মরুদ্যান। সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চল কিছুটা উর্বর। এই অঞ্চলেই কয়েকটি গ্রাম ও শহরও গড়িয়া উঠিয়াছে। শহরগুলির মধ্যে প্রধান হইল **মক্কা** ও **মদিনা**। শহর দুইটি লোহিত সাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি আরব দেশে বসবাস করে। আরব দেশে শেষ বসতি স্থাপন করে ইহুদীদের গোষ্ঠীপতি আব্রাহামের পুত্র ইসমাইলের বংশধরগণ। মক্কার **কাবাশরিফ** ছিল প্রধান ধর্মমন্দির। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইসমাইল। এই মন্দিরে একটি কৃষ্ণবর্ণের পাথর আছে। আরববাসী তথা মুসলিম জগতের নিকট এই পাথরখানি অতি পবিত্র বস্তু। এই

কৃষ্ণবর্ণের পাথরখানি দর্শন করিবার জন্য আজও অগণিত মুসলিম তীর্থযাত্রী প্রতি বৎসর মক্কায় আগমন করেন। ইহা হজ নামে অভিহিত।

হজরত মহম্মদের জন্মের পূর্বে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতি আরবদেশে বাস করিত। ইহাদের মধ্যে একদল শহরে বাস করিত ও অপর দল ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহাদের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। ইহারা **বেদুইন** নামে পরিচিত ছিল। বেদুইনদের প্রধান উপজীবিকা ছিল পশুপালন ও লুণ্ঠন। আরববাসীদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ লাগিয়াই থাকিত। উহাদের মধ্যে নানারকমের কুপ্রথা ও কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। উহারা অসংখ্য মূর্তি পূজা করিত। কাবাশরিফে প্রায় ৩৬০টি মূর্তি ছিল। প্রত্যেক গোষ্ঠী, পরিবার, এমন কি ব্যক্তিরও ভিন্ন ভিন্ন উপাস্য দেবতা ছিল।

তবে আরববাসীদের কয়েকটি বিশেষ গুণ ছিল। উহারা ছিল অতিথিপরায়ণ এবং উহাদের মধ্যে বিদ্যাচর্চারও প্রচলন ছিল।

হজরত মহম্মদ ঃ আনুমানিক ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে কোরেশ বংশে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের জন্ম হয়। এই বংশটি ছিল অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। মক্কার কাবাশরিফের রক্ষণাবেক্ষণ ও তীর্থযাত্রীদের পরিচর্যার ভার এই বংশের লোকেদের উপর অর্পিত ছিল। মহম্মদের পিতা ছিলেন মক্কার অধিবাসী আবদুল্লাহ। মাতা ছিলেন মদিনার অধিবাসিনী আমিনা। মহম্মদের জন্মের কিছু দিন পূর্বেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় এবং ছয় বৎসর বয়সে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। ফলে মহম্মদ তাঁহার পিতামহ ও পিতৃব্যের (আবুতালিব) নিকট লালিত-পালিত হইতে থাকেন।

বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষালাভ করা মহম্মদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। বাল্যকালে তিনি পিতৃব্যের মেষ ও উঠ চরাইতেন। কৈশোরে তিনি আবুতালিবের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য দূর দেশে যাইতেন। বাল্যকাল হইতেই হজরত মহম্মদ ছিলেন ধর্মপরায়ণ ও দয়ালু। আরবদেশের জনগণের দুঃখকষ্ট তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিত। তিনি

ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সংস্পর্শে আসেন এবং ইহার ফলে আরবদের মধ্যে যে সব কুসংস্কার প্রচলিত ছিল তাহা দূর করার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন।

পঁচিশ বৎসর বয়সে হজরত মহম্মদ খাদিজা নামে এক পূণ্যবতী ও বিত্তশালিনী মহিলাকে বিবাহ করেন। কিছুদিন তিনি খাদিজার ব্যবসা-বাণিজ্যের তদারক করেন। কিন্তু ঐশ্বর্য তাঁহাকে শান্তি দিতে পারিল না। তিনি প্রায়ই নির্জন মরুভূমিতে ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। মক্কার নিকট হেরা নামক একটি নির্জন গুহায় তিনি প্রায় পনের বৎসর গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকেন। কথিত আছে, স্বর্গের দূত জাব্রায়েল মহম্মদের নিকট ঈশ্বরের বাণী প্রকাশ করেন এবং তাহা প্রচারের জন্য তাঁহাকে উৎসাহিত করেন। এই সময় হইতে হজরত মহম্মদ পয়গম্বর নামে পরিচিত হন।

মহম্মদের তপস্যা

এইভাবে ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি হয়। ইসলাম শব্দের অর্থ হইল ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পণের দ্বারাই মানুষ প্রকৃত শান্তির অধিকারী হয়। যাহারা এই ধর্মে বিশ্বাসী তাঁহাদের বলা হয় মুসলিম বা মুসলমান। ইসলামে কোন পুরোহিত নাই, প্রত্যেক মুসলমানই ইসলাম ধর্মপ্রচারক।

ইসলাম শব্দের অর্থ

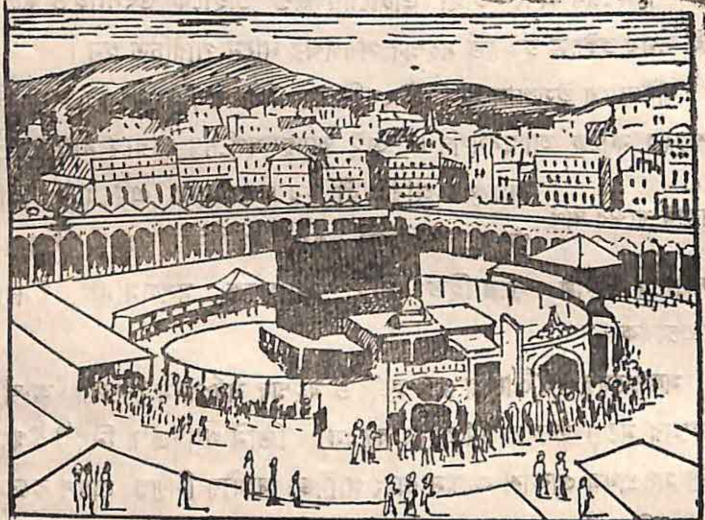
মহম্মদের ধর্ম প্রচার ঃ হজরত মহম্মদ সর্বপ্রথম নিজের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তাঁহার ধর্মপ্রচার করেন। তিনি খাদিজার নিকট ঈশ্বরের বাণী সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন এবং খাদিজা স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইহার তিন বৎসর পর, মহম্মদ প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেন। প্রথম দিকে তাঁহার শিষ্যের সংখ্যা ছিল চল্লিশ। মহম্মদ মক্কাবাসীর নিকট তাঁহার ধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার ধর্মমতের মূলমন্ত্র হইল ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং মহম্মদই ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ (রসুল)। মহম্মদ মূর্তিপূজার তীব্র নিন্দা করিলে মক্কাবাসী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে এবং তাহারা মহম্মদকে হত্যা করার চেষ্টা করে। এই অবস্থায় মহম্মদ কয়েকজন শিষ্যকে লইয়া মদিনায় চলিয়া যান। ইহা ইতিহাসে হিজরত্ নামে

মদিনায় আগমন

খ্যাত। মহম্মদ মক্কা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে। এই সাল হইতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে হিজরী সনের প্রবর্তন হয়।

মদিনাবাসী হজরত মহম্মদকে আশ্রয় দেওয়ায় মক্কাবাসী ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে এবং উহারা মদিনা আক্রমণ করে। কিন্তু মহম্মদ অবিচলিত থাকিয়া তাঁহার ধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। মহম্মদের নৈতিক পবিত্রতা, সততা ও ঈশ্বর-ভক্তি তাঁহাকে শীঘ্রই জনপ্রিয় করিয়া তোলে। মদিনা ও উহার নিকটবর্তী অঞ্চলের বহু লোক তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করে। মহম্মদ মদিনায় একটি ধর্ম-সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর তিনি মক্কার

মক্কাবাসীর আত্মসমর্পণ



কাবাশরিফের পবিত্র প্রস্তর

বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। মক্কাবাসী পরাজিত হইয়া মহম্মদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। দয়ালু মহম্মদ শত্রুদের মনে-প্রাণে ক্ষমা করেন এবং তাহাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি আরববাসীকে মূর্তিপূজা করিতে নিষেধ করেন এবং কাবাশরিফের পবিত্র প্রস্তরখানি ছাড়া অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। ইহার পর হইতে সমগ্র আরব দেশে ইসলাম ধর্মের দ্রুত প্রসার ঘটে। মহম্মদ পারিস্য ও

বাইজানটাইনের নৃপতিদের নিকট দূত পাঠাইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। পারস্য ও বাইজানটাইনের নৃপতিগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

বাষট্টি বৎসর বয়সে হজরত মহম্মদের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর অনতিকাল মধ্যে ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। তাঁহার উপদেশগুলি **কোরাণ শরিফ** নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থখানি মুসলমানদের অতি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। মুসলমানদের বিশ্বাস যে কোরাণের উপদেশগুলি ঈশ্বরেরবাণী।

ধর্মগ্রন্থ কোরাণ

মহম্মদের উপদেশ ঃ হজরত মহম্মদের উপদেশের মূলমন্ত্র ছিল ঈশ্বর বা আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়, যিনিই একমাত্র স্থষ্টিকর্তা ও মোক্ষদাতা। তিনি এই বাণী প্রচার করেন যে তাঁহার উপদেশ সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বা আল্লাহ্-রই উপদেশ। তিনি শিষ্যগণকে নিয়মিত ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে এবং তাঁহাকে ঈশ্বরের পয়গম্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে উপদেশ দেন। ইহা ছাড়া, প্রতিটি ইসলাম ধর্মী ব্যক্তির কয়েকটি অবশ্য কর্তব্যের কথাও তিনি বলিয়া যান—যথা, প্রতিদিন পাঁচবার ঈশ্বরের উপসনা, উপবাস, দান, তীর্থযাত্রা ও অতিথি-সেবা। তিনি তাঁহার অনুগামীগণকে অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবার কথাও বলিয়াছিলেন। তিনি বলপূর্বক ধর্মান্তকরণের প্রবল বিরোধী ছিলেন। মহম্মদের অপর প্রধান উপদেশ ছিল যে সকল মুসলমানই সমান এবং এক ঈশ্বরের সন্তান।

অনুশীলনী

১। হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে আরবদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল?
২। কাবাশরিফ কোথায়? ইহার প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
৩। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক কে ছিলেন? তাঁহার জীবনী সংক্ষেপে লিখ।
৪। হজরত মহম্মদের ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে কি জান?
৫। তিনি শিষ্যদের কি উপদেশ দিয়াছিলেন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতে তুর্কী-অভিযানঃ দিল্লীর সুলতানী রাজত্ব

সূচনা ঃ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের মৃত্যুর সময় (৬৩২ খ্রীঃ) আরবদের আধিপত্য আরব দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর আরবগণ এশিয়ার বহুদেশ জয় করে। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে আরবগণ ভারতের দিকে অগ্রসর হয় এবং সিন্ধু ও মুলতান দখল করে। প্রায় তিন শত বৎসর সিন্ধু ও মুলতানে আরবদের কর্তৃত্ব বজায় থাকে। ইহার পর এশিয়া ও ইওরোপে তুর্কীদের অভিযান শুরু হয়। এশিয়ার তুর্কীস্তান অঞ্চলে তুর্কীরা বাস করিত। ক্রমে উহারা অন্যান্য দেশে ছড়াইয়া পড়ে। আরবদের দ্বারাই তুর্কীরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। তুর্কীরা ছিল বীর যোদ্ধা, সাহসী ও উচ্চাভিলাষী। প্রথমে ইহারা আরবগণ কর্তৃক শাসিত হইত। পরে আরবদের দুর্বলতার সুযোগে তুর্কীগণ শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং বহু স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এইরূপে একটি স্বাধীন তুর্কী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এই রাজ্যের নাম গজনী (আফগানিস্তানে)। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন **আলপ্তগীন**। ভারতে প্রথম তুর্কী অভিযানের নেতা ছিলেন আলপ্তগীনের জামাতা **সবুক্তগীন**। সবুক্তগীনের পুত্র সুলতান মামুদ ছিলেন গজনীবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান।

সুলতান মামুদ ঃ ৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদ গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতা সবুক্তগীনের রাজ্য বিস্তার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি সতেরবার ভারত অভিযানে বাহির হন। কিন্তু ভারতে রাজ্য জয় করা মামুদের উদ্দেশ্য ছিল না। ভারতের পৌত্তলিকদের হত্যা, উহাদের মন্দির ও বিগ্রহাদির ধ্বংস সাধন, ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন এবং ইসলাম জগতে যশ ও খ্যাতি অর্জন করাই মামুদের ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল।

মামুদের উদ্দেশ্য

সিংহাসনে আরোহণের কয়েক বৎসরের মধ্যে মামুদ পাঞ্জাবের হিন্দু শাহী বংশের রাজা জয়পালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। পেশোয়ারের নিকট তুমুল যুদ্ধের পর জয়পাল পরাজিত ও বন্দী হন। জয়পাল প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া ও রাজ্যের কিছু অংশ ছাড়িয়া দিয়া মুক্তিলাভ করেন। জয়পাল এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করেন। ইহার পর মামুদ মুলতানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া তাহা দখল করেন। (১০০৪-৫ খ্রীঃ)। কয়েক বৎসর পর মামুদ জয়পালের পুত্র আনন্দপাল ও অন্যান্য হিন্দু রাজাদের পরাজিত করিয়া সিন্ধুনদ হইতে নগরকোট পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল দখল করেন। কথিত আছে, নগর কোটের দুর্গ লুণ্ঠন করিয়া মামুদ প্রচুর ধনরত্ন লাভ করেন। ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ থানেশ্বরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। হিন্দুগণ বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও পরাজিত হয়। মামুদ থানেশ্বরের বিখ্যাত চক্রস্বামী মন্দিরটি লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর ধনরত্ন লাভ করেন। মামুদ দুইবার কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া ব্যর্থ হন। ইতিমধ্যে আনন্দপালের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র ত্রিলোচন পাল শাহীরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে উদ্যোগী হন। কিন্তু মামুদের নিকট তিনি পরাজিত হন। ইহার পর পাঞ্জাবের শাহী রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে।

মুলতান ও থানেশ্বর আক্রমণ

দিল্লীর নিকটে

পাঞ্জাবের শাহী রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটিলে ভারতের অন্তর্দেশের পথ তুর্কীদের নিকট উন্মুক্ত হয়। মামুদ অতি সহজেই কনৌজ, মথুরা প্রভৃতি নগরগুলি লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর ধনরত্ন লাভ করেন। ইহার পর প্রচুর সৈন্য লইয়া এবং মরুভূমি অতিক্রম করিয়া মামুদ সোমনাথের মন্দির আক্রমণ করেন। গুজরাটের রাজা ভীম ও অন্যান্য হিন্দু রাজন্যবর্গ বিপুল বিক্রমে তুর্কীদের বাধাদান করেন। এক ভীষণ যুদ্ধের পর মামুদ মন্দিরটি ধ্বংস করেন এবং প্রায় তিন শত বিগ্রহের মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন। কথিত আছে, সোমনাথের মন্দির হইতে মামুদ দুই কোটি

কনৌজ, মথুরা ও সোমনাথ আক্রমণ

স্বর্ণমুদ্রা ও অন্যান্য ধনরত্ন প্রচুর পরিমাণে লাভ করেন। ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদের মৃত্যু হয়।

মামুদের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ সুলতান মামুদ ছিলেন সুচতুর, নির্ভীক উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ধনলোভী ও সাহিত্যানুরাগী। ধনলিপ্সা, রণকুশলতা ও ধর্মান্ধতা তাঁহাকে দুর্ধর্ষ যোদ্ধায় পরিণত করিয়াছিল। তিনি ছিলেন ক্ষণক্রোধী। ধনরত্নের প্রতি তাঁহার প্রবল আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও তিনি উহার সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন। তিনি ভারতে যে ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াছিলেন তাহার দ্বারা গজনীতে সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, রাজপথ ও মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। মামুদ নিরক্ষর হইয়াও বিদ্যোৎসাহী ও শিল্পানুরাগী ছিলেন। সেই যুগের বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে **শাহনামা** রচয়িতা ফিরদৌশী ছিলেন অন্যতম। তিনি গজনীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি যাদুঘর ও একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছিলেন।

মহম্মদ ঘোরী ঃ সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর গজনী বংশের দ্রুত পতন ঘটে। সেই সুযোগে ঘোর রাজ্যের সুলতানগণ প্রবল হইয়া উঠেন। গজনী ও হিরাটের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ঘোর রাজ্যটি অবস্থিত ছিল। ঘোর সুলতান গিয়াস-উদ্দিন মহম্মদ গজনী অক্রমণ করিয়া তাহা দখল করেন। গিয়াস-উদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা **মুইজ-উদ্দিন মহম্মদ ঘোরী** সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভারতের ইতিহাসে তিনিই **মহম্মদ ঘোরী** নামে পরিচিত।



মহম্মদ ঘোরী

মহম্মদ ঘোরী ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও যুদ্ধাভিলাষী। ভারত বিজয় করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করাই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণের সময় উত্তর-পশ্চিম ভারতে

তিনটি মুসলিম-শাসিত রাজ্য ছিল, যথা—পাঞ্জাব, মুলতান ও সিন্ধুদেশ। ইহা ছাড়া, ভারতের অভ্যন্তরে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হিন্দু রাজ্য ছিল যথা—কনৌজের রাঠোর বংশ, দিল্লী ও আজমীঢ়ের চৌহান বংশ, বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল বংশ এবং বাংলা ও বিহারের সেন বংশ। উত্তর ভারতের স্বাধীন রাজ্যগুলির মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। এই ঐক্যের অভাব মহম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযানে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণের সময় ভারতের অবস্থা

মহম্মদ ঘোরী প্রথমে উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমান রাজাদের পরাজিত করেন এবং মুলতান, পেশোয়ার ও লাহোর জয় করেন (১১৮৫ খ্রীঃ), কিন্তু ইহাতেও তিনি ক্ষান্ত রহিলেন না। তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল সমগ্র ভারত জয় করিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা।

ভারত অভিযান

পাঞ্জাব দখলের পর মহম্মদ ঘোরী দিল্লী ও আজমীঢ়ের চৌহান বংশীয় রাজা পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। পৃথ্বীরাজের আমন্ত্রণে উত্তর ভারতের প্রায় সকল রাজাই তাঁহার সহিত যোগ দেন। একমাত্র কনৌজের রাজা জয়চাঁদ নিরপেক্ষ থাকেন। মহম্মদ ঘোরী এই সুযোগ গ্রহণ করেন এবং পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করেন। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে **তরাইন** নামক স্থানে উভয় পক্ষে এক তুমুল যুদ্ধ হয়। মহম্মদ ঘোরী শোচনীয় ভাবে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। কিন্তু পর বৎসর (১১৯২ খ্রীঃ) মহম্মদ ঘোরী পুনরায় পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করেন। তরাইনের রণক্ষেত্রে উভয় পক্ষে পুনরায় তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত

তরাইনের দুইটি যুদ্ধ



রাজা পৃথ্বীরাজ

হইয়া বন্দী হন ও নিহত হন। তুর্কীগণ দিল্লী ও আজমীঢ় দখল করে। ইহার পর মহম্মদ ঘোরী কনৌজ আক্রমণ করেন এবং জয়চাঁদ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিহত হন। কনৌজ রাজ্যটি তুর্কীদের দখলে চলিয়া যায়।

কনৌজ দখল

তরাইনের যুদ্ধের পর মহম্মদ ঘোরী **কুতব-উদ্দিন-আইবেক** নামে এক বিশ্বস্ত সেনাপতির হস্তে ভারতে বিজিত রাজ্যগুলির দায়িত্ব অর্পণ করেন। কুতব-উদ্দিনের নেতৃত্বে ভারতে মুসলমান রাজ্যের বিস্তার শুরু হয়। অল্প সময়ের মধ্যে কুতব-উদ্দিন মীরাট, রণথম্ভোর, রহিলখণ্ড প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন এবং দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন বখ্‌তিয়ার খালজী নামে এক ভাগ্যান্বেষী তুর্কী বিহার ও বাংলা আক্রমণ করিয়া জয় করেন। এই ভাবে উত্তর ভারতে এক বিশাল তুর্কী সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে।

কুতব-উদ্দিনের রাজ্যজয়



কুতুব-উদ্দিন-আইবেক

সুলতানি রাজত্বের প্রতিষ্ঠা : ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যু হইলে তাঁহার সাম্রাজ্য কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। **কুতব-উদ্দিন-আইবেক** দিল্লীতে এক স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা সাধারণভাবে **দাসবংশ** নামে পরিচিত। কুতব-উদ্দিন ও তাঁহার পরবর্তী কয়েকজন দিল্লীর সুলতান প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। কুতব-উদ্দিন-আইবেক ১২০৬ হইতে ১২১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা ও সমরকুশলী নৃপতি। তিনি রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে সমর্থ হন। কুতব-উদ্দিনের দানশীলতাও ছিল অতীব প্রশংসনীয়। তিনি দিল্লীর বিখ্যাত **কুতব-মিনারের** নির্মাণকার্য

কুতব-উদ্দিন-আইবেক

শুরু করিয়াছিলেন। ইসলাম ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও তিনি হিন্দুদের প্রতি অনুদার ছিলেন না।


কুতুবমিনার

কুতব-উদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আরাম শাহ্ অল্প সময়ের জন্য রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন অযোগ্য শাসক। এই কারণে দিল্লীর আমীরদের আমন্ত্রণে কুতব-উদ্দিনের জামাতা ইলতুৎমিস দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইলতুৎমিস ১২১০ হইতে ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

ইলতুৎমিস

ইলতুৎমিসকে বহু জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। সেই সময় সুলতানি রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। অসাধারণ ধৈর্য ও সাহসের সহিত তিনি একে একে বিদ্রোহগুলি দমন করেন। গজনীর সুলতানও দিল্লী আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। ইলতুৎমিস বিচক্ষণতার সহিত দিল্লী রক্ষা করিতে সমর্থ হন। সকল বিপদের অবসান ঘটাইয়া ইলতুৎমিস সুলতানি রাজ্যকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে সমর্থ হন।

ভারতে মোঙ্গল আক্রমণ ইলতুৎমিসকে সর্বাধিক ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সময় মোঙ্গল নেতা চিঙ্গিজ খাঁ এক দুর্ধর্ষ মোঙ্গল বাহিনী লইয়া ভারতে উপস্থিত হন। চিঙ্গিজ খাঁ পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ বিধ্বস্ত করেন। কিন্তু তিনি অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া ভারত ত্যাগ করেন। ইলতুৎমিসও এক দারুণ সংকট হইতে রক্ষা পান।

ইলতুৎমিস ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা, সুদক্ষ শাসক ও কূটনীতিজ্ঞ। তিনি সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দেশ-বিদেশের বহু

জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন।

ইলতুৎমিসের চরিত্র ও কৃতিত্ব

তিনি দিল্লীকে ইসলামীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি সুলতানী রাজত্বের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন।

রাজিয়া ঃ ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর তাঁহার এক পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অযোগ্য ও অপদার্থ। এই কারণে দিল্লীর আমীরগণ ইলতুৎমিসের কন্যা রাজিয়াকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। রাজিয়া ছাড়া আর কোন মুসলমান নারী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই।

নারী হইয়াও রাজিয়া পুরুষোচিত অনেক গুণের অধিকারিণী ছিলেন। তিনি পুরুষের বেশে রাজদরবারে বসিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা করিতেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অদম্য সাহস প্রভৃতি গুণ থাকার ফলে রাজিয়া রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হন। তিনি আমীর ওমরাহদের দর্প ও ক্ষমতা চূর্ণ করিতে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। ফলে আমীর-ওমরাহদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ বাধে। তাঁহারা বিদ্রোহী হইয়া রাজিয়াকে সিংহাসনচ্যুত ও হত্যা করেন (১২৪০ খ্রীঃ)।



রাজিয়া

নাসির-উদ্দিন ঃ রাজিয়ার পর বাহরাম শাহ্ ও আলাউদ্দিন মামুদ শাহ্ রাজত্ব করেন (১২৪০-৪৬ খ্রীঃ)। ইঁহারা কেহই সুদক্ষ শাসক ছিলেন না। দিল্লীর আমীরগণ ইলতুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসির-উদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। নাসির-উদ্দিন ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন ধর্মভীরু, সরল ও শান্তিপ্রিয়। তিনি রাজকোষের একটি পয়সাও নিজের জন্য ব্যয় করিতেন না।

তিনি কোরাণ নকল করিয়া তাহা বিক্রয় করিতেন। যাহা আয় হইত তাহার দ্বারাই তিনি নিজের ভরণ-পোষণ নির্বাহ করিতেন। ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। শাসক হিসাবে নাসির-উদ্দিন যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাঁহার উপযুক্ত মন্ত্রী গিয়াস-উদ্দিন বলবন রাজকার্য পরিচালনা করিতেন।

গিয়াস-উদ্দিন বলবন : নাসির-উদ্দিনের মৃত্যুর পর গিয়াস-উদ্দিন বলবন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১২৬৫ হইতে ১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। বলবন প্রথম জীবনে ইলতুৎ মিসের ক্রীতদাস ছিলেন। পরে দক্ষতা ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন। বলবনকে দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে অন্যতম বলা যায়।

শাসন দক্ষতা

তিনি রাজ্য বিস্তার করার পরিবর্তে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দূর করিতেই অধিক যত্নবান ছিলেন। সেই সময় রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। রাজপুত নৃপতিগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাংলায় তুঘরিল-খাঁ নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু বলবন ছিলেন নির্ভীক শাসক। তিনি কঠোর হস্তে একে একে বিদ্রোহগুলি দমন করেন এবং রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গলগণ দারুণ আক্রমণ চালাইতেছিল। বলবন স্বীয় পুত্র মহম্মদকে সীমান্তে প্রেরণ করিয়া মোঙ্গলদের আক্রমণ দমন করেন। বলবন রাজার ও রাজ দরবারের মর্যদা বৃদ্ধি করেন। আমীর ওমরাহগণকে দমন করিয়া তিনি রাজ্যের কল্যাণ সাধন করেন।



গিয়াস-উদ্দিন বলবন

বলবন কঠোর প্রকৃতির হইলেও যথেষ্ট ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি বিচার-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন। বিচারের ক্ষেত্রে তাঁহার নিকট

উচ্চ-নীচে ভেদাভেদ ছিল না। তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহী। সেই যুগের বহু খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক

চরিত্র

বলবনের রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজসভা ইসলামীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। খ্যাতনামা কবি ও ঐতিহাসিক **আমীর খসরু** বলবনের সভাকবি ছিলেন।

খালজী বংশ ঃ বলবনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর **দাস বংশ** দুর্বল হইয়া পড়ে। আমীর ওমরাহগণ পুনরায় ক্ষমতাশালী হইয়া

জালাল-উদ্দিন খালজী

উঠেন। বলবনের পরবর্তী সুলতান কায়কোবাদ ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল ও সম্পূর্ণ অযোগ্য। জালাল-উদ্দিন খালজী নামে জনৈক আমীর কায়কোবাদকে হত্যা করিয়া তাঁহার শিশুপুত্র কায়ুমার্সকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। কিছুদিনের মধ্যেই জালাল-উদ্দিন কায়ুমার্সকে হত্যা করিয়া নিজেই সিংহাসন দখল করেন। এইভাবে দাস বংশের অবসান হয় এবং খালজী বংশের প্রতিষ্ঠা হয় (১২৯০ খ্রীঃ)।

জালাল-উদ্দিন খালজী ছিলেন ধর্মভীরু, উদার ও ন্যায়পরায়ণ। তিনি রাজ্যগ্রাসী সুলতান ছিলেন না। তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয়। উদারতা ও দানশীলতার জন্য তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দুর্বল প্রকৃতি ও দুর্বল শাসনের ফলে রাজ্যে অরাজকতা দেখা দেয়। এই সুযোগে তরুণ খালজী আমীরগণ সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দিন খালজীকে সুলতানের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে আলাউদ্দিন দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি রাজ্য আক্রমণ করিয়া প্রচুর ধনরত্ন লাভ করেন। সামরিক সাফল্য ও প্রচুর ধনরত্ন লাভ করিয়া আলাউদ্দিন সিংহাসন লাভের জন্য অধীর হইয়া উঠেন। অবশেষে তিনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। আলাউদ্দিনের দেবগিরি হইতে ফিরিবার পথে বৃদ্ধ সুলতান জালাল-উদ্দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। কিন্তু অকৃতজ্ঞ আলাউদ্দিন চাতুরী দ্বারা বৃদ্ধ সুলতানকে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন (১২৯৬ খ্রীঃ)।

আলাউদ্দিন খালজী

আলাউদ্দিন খালজী ছিলেন খালজী বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান। তিনি ১২৯৬ হইতে ১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন সীমাহীন স্বেচ্ছাতন্ত্রে ঘোর বিশ্বাসী এবং ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। আলেকজাণ্ডারের ন্যায় আলাউদ্দিন খালজীও দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখিতেন। সমগ্র ভারতে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল।


আলাউদ্দিন খালজী

রাজশক্তি সুদৃঢ় করার চেষ্টা

রাজশক্তি দৃঢ় করার জন্য আলাউদ্দিন সর্বপ্রথম কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করেন। সকল শ্রেণীর লোকদের কার্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য অসংখ্য গুপ্তচর নিয়োগ করেন। তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র মদ্যপান নিষিদ্ধ করেন এবং বিনা খাজনায় জমি ভোগ করার প্রথা নিষিদ্ধ করেন। তিনি এক স্থায়ী সৈন্যবাহিনী গঠন করেন।

রাজস্ব নীতি

আলাউদ্দিনের রাজস্বনীতি ছিল কঠোর। তিনি সকল প্রকার জায়গীর বাজেয়াপ্ত করেন এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের উপর কর ধার্য করেন। উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ কর হিসাবে ধার্য করা হয়। এই সকল ব্যবস্থার ফলে সুবিধাভোগী শ্রেণী বলিয়া আর কেহ রহিল না।

রাজ্য বিস্তার

ইহার পর আলাউদ্দিন রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হন। প্রথমে তিনি গুজরাট জয় করেন, ইহার পর ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মেবার আক্রমণ করেন। কথিত আছে মেবারের অসামান্যা রূপবতী রাজমহিষী পদ্মিনীকে লাভ করার জন্যই আলাউদ্দিন মেবার আক্রমণ করেন। সেই সময় মেবার ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজপুত রাজ্য। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলিবার পর মেবারের রাণা পরাজিত হন। আলাউদ্দিন মেবারের রাজধানী চিতোর দখল

করেন বটে কিন্তু পদ্মিনীকে লাভ করিতে পারিলেন না। আলাউদ্দিনের সৈন্য দুর্গে প্রবেশ করিবার পূর্বেই পদ্মিনী আগুনে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন দেন।

উত্তর ভারত বিজয় সম্পন্ন হইলে আলাউদ্দিন দাক্ষিণাত্য জয়ের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। তাঁহার সেনাপতি ছিলেন মালিক কাফুর।

দাক্ষিণাত্য জয়

মালিক কাফুর বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া একে একে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি, বরঙ্গল, হোয়সল ও পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্যগুলি জয় করেন। এইভাবে আলাউদ্দিন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলেন।

আলাউদ্দিন খালজী ছিলেন নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী। তিনি ছিলেন উগ্র সাম্রাজ্যবাদী। তিনি ছিলেন নির্ভিক সৈনিক, সুদক্ষ সেনাপতি ও

চরিত্র

স্বৈরাচারী শাসক। তিনি আত্মবিশ্বাসে ঘোর বিশ্বাসী ছিলেন। স্বয়ং নিরক্ষর হইলেও তিনি সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

আলাউদ্দিন খালজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মোবারক খালজী সিংহাসনে আরোহণ করেন। মোবারক ছিলেন অযোগ্য শাসক।

খালজী বংশের পতন

নাসির-উদ্দিন খসরু নামে সুলতানের জনৈক অনুচর মোবারক খালজীকে হত্যা করিয়া সিংহাসন দখল করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই পাঞ্জাবের শাসনকর্তা গিয়াস-উদ্দিন-তুঘলক খসরুকে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এইভবে খালজী বংশের পতন হয়।

তুঘলক বংশঃ ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াস-উদ্দিন-তুঘলক দিল্লীর সিংহাসন দখল করিয়া তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রাজ্যে

মহম্মদ-বিন-তুঘলক

শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হন। তিনি ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তুলঘক বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন গিয়াস-উদ্দিনের পুত্র মহম্মদ-বিন-তুলঘক। তিনি ১১৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

রাজ্যের উন্নতি কল্পে মহম্মদ-বিন-তুঘলক কয়েকটি বিধি-ব্যবস্থা

গ্রহণ করেন। তিনি রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্ত করেন; রাজ্যের সর্বত্র রাজস্বের হার এক প্রকার করেন; কৃষির উন্নতির জন্য কৃষি বিভাগের প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজধানীর পরিবর্তন

মহম্মদ-বিন-তুঘলকের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিকল্পনা হইল দিল্লী হইতে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করা। নূতন রাজধানীর নাম হয় দৌলতাবাদ। দিল্লী ঠিক ভারতের মধ্যস্থলে অবস্থিত নয়—এই কারণেই তিনি রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সুলতানের আদেশে দিল্লীর সমস্ত নাগরিককে দৌলতাবাদে যাইতে হয়। দিল্লী হইতে দৌলতাবাদের দূরত্ব প্রায় সাত শত মাইল। তখনকার দিনে যানবাহনের সুবিধা ছিল না। সুতরাং দিল্লী হইতে সকলকে পদব্রজে দেবগিরিতে যাইতে হয়। ইহার ফলে পথিমধ্যে বহু লোকের মৃত্যু হয়। সুলতান নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া পুনরায় সকলকে দিল্লী ফিরিয়া যাইবার আদেশ দেন।



মহম্মদ-বিন-তুঘলক

রাজস্ব বৃদ্ধি

রাজত্বের প্রথম দিকে অর্থাভাবের জন্য সুলতান দিল্লীর নিকটবর্তী অঞ্চলে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন। অতিরিক্ত কর প্রদান করিতে না পারিয়া এই অঞ্চলের অধিবাসীগণ বনে-জঙ্গলে পলাইয়া যায়। রাজকর্মচারীদের অত্যাচারে এই অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আলাউদ্দিন খালজীর ন্যায় মহম্মদ-বিন-তুঘলকও দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখিতেন। তিনি হিমালয় পর্বতের মধ্যভাগে কারাজল নামক স্থানে এক রাজ্য জয় করার জন্য একটি বিশাল সৈন্য বাহিনী সংগ্রহ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। ইহার পর তিনি

দিগ্বিজয়ের ব্যর্থ পরিকল্পনা

পারস্য জয় করিবার পরিকল্পনা করেন এবং বহু সৈন্য সংগ্রহ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা ব্যর্থ হয়।

সুলতানের নানা প্রকার খামখেয়ালীর জন্য রাজকোষ শূন্য হইয়া যায়। এই কারণে তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যের সমান মূল্যে তাম্র নোটর প্রবর্তন করেন। কিন্তু নোট জাল করা বন্ধ করিবার কোন ব্যবস্থাই তিনি করেন নাই। ফলে ঘরে ঘরে জাল নোট তৈয়ারী হইতে থাকে। বণিকেরা তাম্র নোট গ্রহণে অসম্মত হয়। সুলতান নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তাম্র নোট বন্ধ করিয়া দেন। মহম্মদ-বিন-তুঘলকের অদূরদর্শিতা, জনসাধারণের প্রতি নৃশংসতা ও গুরু করভার প্রভৃতি কারণে রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর ও বাহ্‌মনী নামে দুইটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়।

তাম্র নোটের প্রবর্তন

মহম্মদ-বিন-তুঘলকের চরিত্র ছিল বিচিত্র। তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তিনি ছিলেন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি ও গণিতশাস্ত্রবিদ। তিনি পণ্ডিত ও গরীবদের অকাতরে দান করিতেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন ক্ষণক্রোধী, অব্যবস্থিত চিত্ত, হিংস্র ও অদূরদর্শী। এই সকল কারণে অনেকে তাঁহাকে **পাগলা সুলতান** আখ্যা দিয়াছেন।

ফিরোজ তুঘলকঃ মহম্মদ-বিন-তুঘলকের পর তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা ফিরোজ তুঘলক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফিরোজ ছিলেন ধর্মপরায়ণ, দয়ালু ও প্রজাহিতৈষী সুলতান। তিনি রাজ্য জয় অপেক্ষা প্রজাদের মঙ্গলসাধন করিতেই অধিক উৎসাহী ছিলেন। তিনি রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে যত্নবান হন। তিনি বহু রকমের অবৈধ খাজনা বাতিল করেন, ভূমি-কর হ্রাস করেন এবং কোরাণের নির্দেশমত মাত্র চারি প্রকারের কর ধার্য করেন। তিনি অবৈধ শুল্ক বাতিল করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সহজ করেন। কৃষির উন্নতির জন্য তিনি জলাশয়, খাল ও সেচের ব্যবস্থা করেন। বেকার সমস্যা দূর করার জন্য, দুস্থ পরিবারের কন্যাদের বিবাহ এবং অনাথ ও

বিধবাদের ভরণ-পোষণের জন্য তিনি **দেওয়ানে খয়রাত** নামে একটি পৃথক বিভাগের প্রতিষ্ঠা করেন। দরিদ্রদের চিকিৎসার জন্য তিনি **দার-উল-সাফা** নামে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লীর নিকটে তিনি ফিরোজাবাদ নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু সামরিক ক্ষেত্রে ফিরোজ তুঘলক ব্যর্থতার পরিচয় দেন। তিনি বিদ্রোহী প্রদেশগুলিকে নিজের অধীনে আনিতে ব্যর্থ হন। বাংলায় দুইবার অভিযান চালাইয়া তিনি ব্যর্থ হন। দাক্ষিণাত্য জয় করিবার কোন চেষ্টাই তিনি করেন নাই।

তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণ ও তুঘলক বংশের পতন : ফিরোজ তুঘলকের মৃতুর পর (১৩৮৮ খ্রীঃ) রাজ্যে পুনরায় অরাজকতা দেখা দেয়। মালব, গুজরাট, জৌনপুর প্রভৃতি প্রদেশগুলিতে স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। তুঘলক বংশের শেষ সুলতান নাসির-উদ্দিন মামুদের রাজত্বকালে সমরখন্দের রাজা তৈমুরলঙ্গ ভারত আক্রমণ করেন। ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া তৈমুরলঙ্গ সিন্ধু ও ঝিলাম নদী অতিক্রম করিয়া তালাম্বা দখল করেন। ইহার পর তিনি দিল্লী দখল করেন। কয়েকদিন ধরিয়া দিল্লী, সিরি প্রভৃতি নগরগুলিতে হত্যালীলা ও লুণ্ঠন চলে। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে বন্দী করিয়া তৈমুর স্বদেশে ফিরিয়া যান। দিল্লী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। সর্বত্র অরাজকতা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তুঘলক বংশের পতন ঘটে।

সৈয়দ ও লোদী বংশ : তুঘলক বংশের পতনের পর তৈমুরের ভারতীয় প্রতিনিধি ও মুলতানের শাসনকর্তা খিজির খাঁ দিল্লীর সিংহাসন দখল করিয়া সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হজরত মহম্মদের বংশধর ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশকে সৈয়দ বংশ বলা হয়। এই বংশের চারিজন সুলতান যথাক্রমে ১৪১৪ হইতে ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

সৈয়দবংশের পর **বহলুল লোদী** নামে জনৈক আফগান আমীর দিল্লীতে লোদী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন (১৪৫১ খ্রীঃ)। তাঁহার আমলে দোয়াব অঞ্চলে দিল্লীর শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং জৌনপুর পুনরায়

দিল্লীর দখলে আসে। বহলুলের পর তাঁহার পুত্র সিকন্দর লোদী সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিকন্দর লোদী ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা ও সুশাসক। তিনি ছিলেন সাহিত্যানুরাগী। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছিল। সিকন্দরের পর তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম লোদী সুলতান হন। তিনি আফগান আমীরদের দমন করার চেষ্টা করিলে উহারা সুলতানের শত্রুতে পরিণত হন। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী ও সুলতানের আত্মীয় আলম খাঁ সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। আলম খাঁ কাবুলের অধিপতি বাবরকে দিল্লী আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করেন। সেই সঙ্গে লোদী বংশেরও পতন ঘটে এবং ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

সুলতানি সাম্রাজ্যের পতনের কারণঃ মহম্মদ-বিন-তুঘলকের খামখেয়ালী ও অদূরদর্শিতা সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল করিয়াছিল। সর্বত্র বিদ্রোহ ও অরাজকতা সাম্রাজ্যের ঐক্য বিনষ্ট করিয়াছিল। ফিরোজ তুঘলকের ধর্মান্ধতা ও দুর্বল শাসনের ফলে সাম্রাজ্যের পতন দ্রুত হয়। সুলতানদের ক্রীতদাস প্রীতি সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিপজ্জনক করিয়া তুলিয়াছিল। অবশেষে তৈমুরলঙ্গের আক্রমণের ফলে সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়ে।

অনুশীলনী

১। সুলতান মামুদ কে ছিলেন? তাঁহার ভারত অভিযান সম্বন্ধে কি জান?

২। মহম্মদ ঘোরীকে ভারতের মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কেন?

৩। ইলতুৎমিস ও বলবন সম্বন্ধে কি জান?

৪। খালজী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান কাহাকে বলা হয়? তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তার ও চরিত্র বর্ণনা কর।

৫। মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকাল সংক্ষেপে বর্ণনা কর। তাঁহাকে 'পাগলা রাজা' বলা হয় কেন?

৬। সুলতানি সাম্রাজ্যের পতনের কি কি কারণ ছিল?

সপ্তম অধ্যায়

বিজয়নগর ও বাহ্‌মনী রাজ্য

বিজয় নগর

মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে উত্তর ভারতে যখন অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা দেয়, সেই সময় দক্ষিণ ভারতের হিন্দুগণ **হরিহর** ও **বুক্ক** নামক দুই জননায়কের নেতৃত্বে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন (১৩৩৬ খ্রীঃ)। মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করার উদ্দেশ্য লইয়াই এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। বিজয়নগর রাজ্যে চারিটি রাজবংশ যথাক্রমে রাজত্ব করে, যথা—**সঙ্গম বংশ, সালুভ বংশ, তুলুভ বংশ** ও **আরবিড়ু বংশ**।

উৎপত্তি

সঙ্গম বংশের প্রথম দুইজন শাসক ছিলেন হরিহর ও বুক্ক। বুক্ক-র পুত্র দ্বিতীয় হরিহর সর্বপ্রথম 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে মহীশূর, কানাড়া, ত্রিচিনপল্লী ও কাঞ্চী বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁহার আমলে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজ্য বাহ্‌মনীর সহিত সংগ্রাম শুরু হয়। দ্বিতীয় হরিহর ছিলেন শিবের উপাসক। দ্বিতীয় হরিহরের পর তাঁহার পুত্র **প্রথম দেবরায়** রাজা হন। তিনি ১৪০৪ হইতে ১৪২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার আমলে বাহ্‌মনী রাজ্যের সহিত যুদ্ধ চলিতে থাকে। সঙ্গম বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন **দ্বিতীয় দেবরায়**। তিনি ১৪২২ হইতে ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বিজয়নগর রাজ্য সিংহলের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তাঁহার আমলে পারস্যের রাষ্ট্রদূত আবদুর রজাক বিজয়নগরে আসিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দেবরায়ের মৃত্যুর পর সঙ্গম বংশ দুর্বল হইয়া পড়ে। এই সুযোগে চন্দ্রগিরির শাসনকর্তা **নরসিংহ সালুভ** বিজয়নগরের সিংহাসন দখল করিয়া সালুভ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। নরসিংহ ছিলেন সুদক্ষ

সঙ্গম বংশ

শাসক। তিনি রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনেন। তিনি ১৪৮৬ হইতে ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

সালুভ বংশ

নরসিংহের পরবর্তী রাজা ছিলেন **ইমদীনরসিংহ**। তিনি ছিলেন অযোগ্য শাসক। তাঁহার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া রাজ্যের সেনানায়ক **নরসনায়ক** শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করেন। নরসনায়কের পুত্র **বীর নরসিংহ** বিজয়নগর রাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া **তুলুভ** বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।



কৃষ্ণদেব রায়

তুলুভ বংশ

তুলুভ বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন **কৃষ্ণদেব রায়**। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা ও সুশাসক। তিনি উড়িষ্যা রাজ্যের নিকট হইতে উদয়গিরি ও বাহ্‌মনী সুলতানদের নিকট হইতে রায়চুর দোয়াব পুনরুদ্ধার করেন। তিনি শিল্প ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন।

কৃষ্ণদেব রায়ের পর বিজয়নগর রাজ্য পুনরায় দুর্বল হইয়া পড়ে। রাজা সদাশিব রায়ের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর, আহম্মদনগর ও গোলকুণ্ডার সুলতানগণ একযোগে বিজয়নগর আক্রমণ করেন। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে **তালিকোট** নামক স্থানে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বিজয়নগরের শোচনীয় পরাজয় হয়। বিজয়নগর রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। এই সুযোগে মন্ত্রী রাম রায়ের ভ্রাতা তিরুমাল রাজা সদাশিবকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া আরবিড়ু বংশের প্রতিষ্ঠা করেন (১৫৭০ খ্রীঃ)। তিরুমালের পর দ্বিতীয় রঙ্গ ও দ্বিতীয় বেঙ্কট রাজা হন। বিজয়নগরের শেষ রাজা ছিলেন তৃতীয় রঙ্গ। তৃতীয় রঙ্গের রাজত্বকালে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং

আরবিড়ু বংশ

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার ক্রমাগত আক্রমণের ফলে বিজয়নগর রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে এবং প্রদেশগুলি একে একে স্বাধীন হইয়া যায়।

বিজয়নগর রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ঃ বিজয়নগর রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ছিল উন্নত। রাজার ক্ষমতা ছিল সীমাহীন এবং তিনি ছিলেন প্রজাহিতৈষী। ধর্মের অনুশাসন অনুসারে দেশ শাসন করার রীতি প্রচলিত ছিল। রাজাকে শাসনকার্যে সাহায্য করার জন্য একটি মন্ত্রিসভা ছিল। সমগ্র রাজ্যটি কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ নায়ক নামে পরিচিত ছিলেন। নায়কদের নিজস্ব দরবার ও সৈন্যবাহিনী ছিল। প্রদেশগুলি কয়েকটি জেলা এবং জেলাগুলি কয়েকটি গ্রাম লইয়া গঠিত ছিল। **পঞ্চায়েত** গ্রামের শাসনকার্য তদারক করিত। উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ ভূমিকর হিসাবে গৃহীত হইত। বিজয়নগরের সৈন্যবাহিনী ছিল বিশাল। পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও হস্তিবাহিনী এই চারি প্রকার বাহিনী লইয়া সৈন্যবাহিনী গঠিত ছিল।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি ঃ বিজয়নগর রাজ্য হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। বিজয়নগর রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃত ভাষা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। তেলেগু, তামিল প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষাগুলিও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। বৈদিক গ্রন্থের টীকাকার মাধবাচার্য ও সায়নাচার্য বিজয়নগর রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণদেব রায় একজন সুসাহিত্যিক ও কবি ছিলেন। তাঁহার প্রধান সভাকবি **পোদ্দন** ছিলেন তেলেগু গ্রন্থকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিজয়নগর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পেও উন্নত ছিল। ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইল **হাজার মন্দির** ও **বিঠলস্বামী মন্দির**।

বাহ্‌মনী

দাক্ষিণাত্যের অপর উল্লেখযোগ্য রাজ্য হইল বাহ্‌মনী রাজ্য। মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে দেবগিরির মুসলমান আমীরগণ বিদ্রোহী হইয়া দেবগিরি নগরটি দখল করেন। তাঁহারা **ইসমাইল মাখ**

নামে এক আমীরকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু বৃদ্ধ ইসমাইল হাসান নামে অপর এক আমীরের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। হাসান আলাউদ্দিন **বাহ্‌মান শাহ্‌** উপাধি ধারণ করিয়া বাহ্‌মনী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন (১৩৪৭ খ্রীঃ)। আল্লাউদ্দিন বাহ্‌মান শাহ্‌ গুলবর্গায় রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা। তিনি গোয়া, কানপুর, দভল ও তেলিঙ্গনা জয় করেন। তিনি সমগ্র রাজ্যকে চারিটি প্রদেশে বিভক্ত করেন, যথা—গুলবর্গা, দৌলতাবাদ, বেরার ও বিদর। ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাহ্‌মান শাহের মৃত্যু হয়।

উৎপত্তি

বাহ্‌মান শাহের পর তাঁহার পুত্র প্রথম মহম্মদ শাহ্‌ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। মহম্মদ শাহের আমলেই বাহ্‌মনী ও বিজয়নগর রাজ্যের মধ্যে সুদীর্ঘ সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মুজাহিত শাহের আমলেও বিজয়নগরের সহিত যুদ্ধ চলে। পরবর্তী সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ শাহ্‌ (১৩৭৮-৯৭খ্রীঃ) ছিলেন শান্তিপ্রিয় এবং শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি অধিক অনুরাগী। বাহ্‌মান শাহের পৌত্র ফিরোজ শাহের আমলে (১৩৯৭-১৪২২ খ্রীঃ) পুনরায় বাহ্‌মনী ও বিজয়নগরের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ফিরোজ শাহ্‌ শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন। এই পরাজয়ের ফলে বাহ্‌মনী রাজ্যের কিছু অংশ বিজয়নগরের হস্তগত হয়।

ফিরোজ শাহের পর **আহম্মদ শাহ্‌ দ্বিতীয় আলাউদ্দিন, নিজাম শাহ্‌** ও **তৃতীয় মহম্মদ শাহ্‌** যথাক্রমে ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। শাসক হিসাবে তৃতীয় মহম্মদ শাহ্‌ ছিলেন অযোগ্য। কিন্তু তাঁহার মন্ত্রী মামুদ গাওয়ানের শাসন দক্ষতার ফলে বাহ্‌মনী রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে উঠে। মামুদ গাওয়ান বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া বাহ্‌মনী রাজ্যের সীমা বিস্তার করেন। মামুদ গাওয়ান শাসনব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। তিনি রাজস্ব, বিচার ও শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন। মামুদ গাওয়ানের ব্যক্তিগত জীবন ছিল নিষ্কলুষ ও অনাড়ম্বর।

মামুদ গাওয়ান

বাহ্মনী রাজ্যের শেষ সুলতান ছিলেন **কলিম-উল্লাহ শাহ্** ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে বাহ্মনী রাজ্যের অবসান ঘটে। বাহ্মনী রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি ঘটে, যথা—বিজাপুরের আদিল-শাহ বংশ, আহম্মদনগরের নিজাম-শাহী বংশ, বেরারের ইমাদ-শাহী বংশ, গোলকুণ্ডার কুতুব-শাহী বংশ এবং বিদরের বারিদ-শাহী বংশ।

বাহ্মনী বংশের প্রকৃতি ও কৃতিত্ব ঃ বাহ্মনী বংশের অধিকাংশ সুলতান ছিলেন অত্যাচারী ও ব্যাভিচারী। শাসনব্যবস্থা ছিল খুবই দুর্বল। এই বংশের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ষড়যন্ত্র, অন্তর্বিপ্লব ও প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সহিত অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহ। **নিকিতিন** নামে এক রুশ পর্যটক বাহ্মনী রাজ্য পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায় যে বাহ্মনী রাজ্য ছিল জনবহুল, কিন্তু জনসাধারণের অবস্থা ছিল শোচনীয়। অভিজাতগণ ছিলেন ধনী এবং তাঁহারা সর্বদাই বিলাস-ব্যসনে নিমগ্ন থাকিতেন। আমীরদের ব্যক্তিগত সৈন্যবাহিনী ছিল। বাহ্মনী সুলতানদের অনেকেই স্থাপত্য শিল্পের এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। **গুলবর্গা ও বিদরের** স্থাপত্য শিল্পগুলি তাঁহাদের কীর্তি। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহারা ছিলেন উদার। তাঁহাদের আমলে বাহ্মনী রাজ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম সমভাবে প্রচলিত ছিল।

অনুশীলনী

১। বিজয়নগর রাজ্যের উত্থান ও পতনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। বিজয়নগর রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান?

৩। বিজয়নগর রাজ্যের শাসনব্যবস্থা বর্ণনা কর।

৪। বিজয়নগর রাজ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতির কিরূপ বিকাশ ঘটিয়াছিল?

৫। বাহ্মনী রাজ্যের উত্থান ও পতনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৬। মামুদ গাওয়ান কে ছিলেন? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান?

৭। বাহ্মনী রাজ্যের প্রকৃতি ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকগণ

ভূমিকা ঃ তুর্ক-আফগান যুগে ভারতে ধর্ম ও সমাজ জীবনে এক প্রবল অন্দোলনের সূত্রপাত হয়। মহম্মদ-বিন-ঘোরীর সময় হইতে উত্তর ভারত ইসলামের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। বিদেশ হইতে আগত ইসলামীয় ধর্ম ও সামাজিক আদর্শ হিন্দুধর্ম ও সমাজে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ইসলাম ধর্মের গণতান্ত্রিক আদর্শ, মুসলমান পীর ও দরবেশদের নৈতিক পবিত্রতা হিন্দু সমাজের অবহেলিত জনগণকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করে। শংকরাচার্যের সময় হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গোঁড়ামি হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত নিম্নবর্ণের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেইসময়ে হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করার জন্য একদল ধর্মীয় ও সমাজ-সংস্কারকদের আবির্ভাব ঘটে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন **রামানন্দ, কবীর, শ্রীচৈতন্য, নানক ও রামদাস**।

ভক্তিবাদ ও সুফীবাদ ঃ ইসলাম ধর্মের সংস্পর্শে আসিবার ফলে হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি অন্যদিকে ইসলাম ধর্মের গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাবে হিন্দু ধর্মে **ভক্তিবাদ** বা উদার ধর্মনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়। **ভক্তিবাদ** আদর্শ খুব প্রাচীন। হিন্দুশাস্ত্রে জীবাত্মার মুক্তির জন্য তিনটি বিশেষ গুণের উল্লেখ আছে, যথা—**জ্ঞান, কর্ম** ও **ভক্তি**। সুলতানি আমলে হিন্দুধর্মকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্যই হিন্দু ধর্মাচার্যগণ **ভক্তিবাদ** আন্দোলন শুরু করেন। ভক্তিবাদ আন্দোলন প্রথমে দক্ষিণ ভারতে শুরু হয়। পরে তাহা উত্তর ভারতে প্রসারলাভ করে। ভক্তিবাদের মূল কথা হইল—অন্তরের পবিত্রতা, ঈশ্বরে ঐকান্তিক ভক্তি, সৎকর্ম, সদাচরণ ও একেশ্বরে বিশ্বাস। ইহাতে বর্ণাশ্রমের কোন স্থান নাই। ধর্মাচার্যদের এই বাণী হিন্দু ও মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হইয়াছিল।

হিন্দুধর্মে ও সমাজে যখন এইরূপ সংস্কার চলিতেছিল, সেই সময় ইসলাম ধর্মেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ঈশ্বরের সহিত মানুষের একাত্মবোধ ও মানুষে মানুষে সমতার আদর্শ সেই যুগে ইসলাম ধর্মেও জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছিল। ইসলাম ধর্মের উদারনৈতিক সংস্কার আন্দোলন সুফীবাদে প্রকাশ পায়। সুতরাং হিন্দুধর্মে ভক্তিবাদ ও ইসলাম ধর্মে সুফীবাদ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের পথ সহজ করে। 'সুফ' কথাটির অর্থ হইল পশম বা উল। সুফী-সন্তরা শুধু যে বৈরাগ্যধর্মী ছিলেন এমন নহে, তাঁহারা মরমী ভক্তও ছিলেন। এই কারণে সুফীমতকে মরমিয়াবাদ বলা হইয়া থাকে। ভারতে সুফী-সাধুদের মধ্যে **নিজাম-উদ্দিন-আউলিয়া, মইন-উদ্দিন-চিশ্‌তি** প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইসলাম ধর্মের সংস্কারে সুফী-সন্তরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

রামানন্দ ঃ রামানন্দ ছিলেন রামানুজের শিষ্য। তিনি এলাহাবাদে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি তাঁহার ধর্মমত প্রচার করেন। তিনি রাম ও সীতার উপাসক ছিলেন তিনি জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের নিকট ভক্তিবাদ প্রচার করেন। তিনিই সর্বপ্রথম দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের ভক্তিবাদ আন্দোলনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন। তিনি হিন্দী ভাষায় তাঁহার ধর্মমত প্রচার করিতেন। বারাণসীতে আচার্য রাঘবানন্দের নিকট তিনি ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি গোঁড়া বৈষ্ণবদের কতকগুলি আচরণ পরিত্যাগ করেন এবং বৈষ্ণবধর্মের এক নূতন সংঘ স্থাপন করেন। তাঁহার ধর্মমতের মূল কথা ছিল ঈশ্বরে ঐকান্তিক ভক্তি ও প্রেম। তিনি বর্ণভেদ প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন বটে কিন্তু নিম্নবর্ণের বৈষ্ণবদের সহিত একাসনে বসিয়া আহার করিতে তাঁহার কোন দ্বিধা ছিল না। তাঁহার বারজন প্রধান শিষ্য ছিলেন—ইঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন ক্ষৌরকার (সৈনদাস), একজন চর্মকার (রায়দাস) ও একজন মুসলমান তন্তুবায় (কবীর। রামানন্দ তাঁহার বাণী লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। তবে তাঁহার

শিষ্যদের উপদেশের মধ্যেই তাহা প্রকাশ পায়। শিখদের ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থসাহেবে রামানন্দের একটি সংগীত লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার ধর্মমত জনপ্রিয় করার জন্য তিনি সংস্কৃতের পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেন।

কবীর ঃ কবীরের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা জানা যায় না। তিনি সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ সন্তান বলিয়া মনে করেন। শৈশবে তিনি নীরু নামে এক মুসলমান তাঁতীর নিকট লালিত-পালিত হন এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। কবীর প্রথমে তাঁতীর বৃত্তিই গ্রহণ করেন। কিন্তু ধর্মের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ছিল প্রবল। রামানন্দের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল।


কবীর

কথিত আছে যে রামানন্দ প্রতিদিন যে পুষ্করিণীতে স্নান করিতেন, কবীর একদিন সেই পুষ্করিণীর ঘাটে শুইয়া পড়েন। রামানন্দ স্নান করিতে আসিয়া অন্যমনস্কতা বশতঃ কবীরকে ছুঁইয়া ফেলেন এবং 'রাম রাম' বাণী উচ্চারণ করেন। কবীর এই রামনাম মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং রামানন্দ তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। কবীর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পবিত্র জীবনযাপন শুরু করেন। মোক্ষলাভের জন্য কবীর সন্ন্যাস বা আত্মনিপীড়নের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি নিজেই স্ত্রী ও সন্তান লইয়া গৃহীজীবন যাপন করেন এবং তাঁত বুনিয়া নিজের জীবিকা অর্জন করেন। কবীর লেখাপড়া না জানিলেও স্বভাবকবিত্বের অধিকারী ছিলেন। হিন্দু দর্শন ও সুফী-সন্তদের প্রভাব কবীরকে প্রভাবিত করিয়াছিল। কবীর হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করিতেন না। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক

গড়িয়া তোলাই তাঁহার ধর্মমতের মূল লক্ষ্য ছিল। তাঁহার জ্ঞান, ভক্তি, নিষ্ঠা, সদাচার ও রামনাম কীর্তনের কথা প্রচারিত হইলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্য হইতে তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বাড়িতে থাকে। জাতিভেদ প্রথা, মূর্তিপূজা প্রভৃতি তিনি নিন্দা করিতেন। রাম ও আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়—ইহাই ছিল কবীরের ধর্মমতের মূল কথা। তিনি মানসিক পবিত্রতা ও ঈশ্বরের প্রতি অবিচল ভক্তির উপর অধিক গুরুত্ব দিতেন। তাঁহার শিষ্যরা কবীরপন্থী নামে পরিচিত ছিলেন। বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহিত কবীরের সদ্ভাব ছিল। কিন্তু উপাসনা বা ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের দিক হইতে কবীরপন্থীরা বৈষ্ণবদের প্রভাব স্বীকার করিতেন না। কবীরপন্থীরা একমাত্র কবীরেরই ভজনা করিতেন। সাধারণ লোকদের মধ্যে ধর্মমত প্রচারের জন্য কবীর হিন্দী ভাষায় বহু দোঁহা রচনা করেন। কথিত আছে, মৃত্যুর পর তাঁহার মরদেহের সৎকার লইয়া হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। হিন্দু শিষ্যগণ তাঁহার মরদেহ দাহ করিতে চাহেন এবং মুসলমান শিষ্যগণ তাহা কবর দিতে চাহেন। শেষে তাঁহার মরদেহের আবরণ তুলিয়া ফেলা হইলে মরদেহের পরিবর্তে দেখা যায় রাশিকৃত ফুল। হিন্দু শিষ্যরা সেই ফুলের এক অংশ লইয়া বারাণসীতে হিন্দু প্রথা অনুসারে তাহা দাহ করেন এবং মুসলমান শিষ্যরা বাকী ফুলগুলি সমাধিস্থ করেন।

ধর্মমত

শ্রীচৈতন্য ঃ বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারকদের মধ্যে চৈতন্যদেব ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়ার এক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ ও শিক্ষিত পণ্ডিত। তাঁহার মাতার নাম ছিল শচীদেবী। শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিত্ব ছিল সুমধুর এবং তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। তিনি অনেক নামে পরিচিত ছিলেন, যথা—বিশ্বম্ভর, নিমাই, গৌর ইত্যাদি। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল বিশ্বম্ভর। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর তাঁহার নাম হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সংক্ষেপে চৈতন্য। তাঁহার ভক্তগণ

তাঁহাকে 'প্রভু' ও 'মহাপ্রভু' বলিয়াও অভিহিত করেন। ইহা ছাড়া, দেহ লাবণ্যের জন্য তিনি 'গৌর', 'গৌরাঙ্গ' প্রভৃতি নামেও প্রসিদ্ধ হন।

বাল্যকালে নিমাই ছিলেন অত্যন্ত দুরন্ত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই বালককে দেখিলে সকলে ক্রোধ ভুলিয়া যাইত। শৈশবে নবদ্বীপের সকলের কাছে তিনি অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে বিদ্যারম্ভ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ব্যাকরণ, কাব্য ও অলংকার অনায়াসে আয়ত্ত করেন। তাঁহার প্রতিভা দেখিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর বিশ্বম্ভর নিজেই একটি টোল খোলেন। তখন তাঁহার বয়স ষোল। তাঁহার টোলের খ্যাতি শীঘ্রই ছড়াইয়া পড়ে এবং বহু ছাত্র ইহাতে যোগ দেয়। কিছুদিন নবদ্বীপে অধ্যাপনার পর তিনি পূর্ববঙ্গে এবং পিতৃভূমি শ্রীহট্টে যাইয়া বিদ্যা বিতরণ করেন। প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়ার সর্পদংশনে মৃত্যু হইলে মাতার একান্ত অনুরোধে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। কিছুদিন পরে তিনি গয়ায় ঈশ্বরপুরীর নিকট গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বম্ভরের চরিত্র যেন বদলাইয়া গেল। তিনি ভক্তির প্লাবনে যেন দিশাহারা ও উন্মাদপ্রায় হইয়া গেলেন। তিনি যেন নূতন মানুষ হইয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া আসেন।



শ্রীচৈতন্য

ক্রমেই বিশ্বম্ভরের অন্তরে বৈরাগ্যভাব তীব্র হইতে থাকে এবং তিনি অধ্যাপনা ত্যাগ করেন। পরিশেষে তিনি গৃহাশ্রম ছাড়িয়া কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে সংকল্প করেন। মায়ের অনুমতি লইয়া বিশ্বম্ভর ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। গুরু কেশব ভারতী শিষ্যের নাম দিলেন **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য**।

ইহার পর চৈতন্য উত্তর ও দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করিয়া জীবনের শেষ আঠার বৎসর পুরীতে অতিবাহিত করেন।

নগর সংকীর্তনের মাধ্যমে চৈতন্য ও তাঁহার ভক্তেরা বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। চৈতন্যের প্রচারিত ধর্মের মূল কথা ছিল বৈরাগ্য, জীবে দয়া ও শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি গভীর প্রেম। তিনি জাতিভেদ প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে শিষ্য গ্রহণ করেন। যবন হরিদাস চৈতন্যের শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও মানসিক পবিত্রতার উপর তিনি অধিক জোর দিতেন। চৈতন্য অহিংসা পরম ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন। হিন্দু-অহিন্দু, পণ্ডিত-মূর্খ, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে চৈতন্য তাঁহার ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। জাতিধর্ম নির্বিচারে সকল মানুষের সমান অধিকারের বাণী তিনি প্রচার করেন। বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যায় তাঁহার ধর্মের বাণী গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেব অপ্রকট হন।

ধর্মমত

নানক ঃ শিখ ধর্মের প্রবর্তক নানক মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম সংস্কারক ছিলেন। ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের নিকট তাল ওয়ান্দি নামক গ্রামে গুরু নানকের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা কালু ছিলেন গ্রামের হিসাব রক্ষক। তাল ওয়ান্দির বিদ্যালয়ে নানকের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। প্রথম হইতেই শিক্ষার প্রতি তাঁহার বৈরাগ্য ছিল। তিনি নির্জনে ও সাধু সঙ্গে দিন যাপন করিতেই অধিক আনন্দ পাইতেন।


নানক

পিতার আগ্রহে নানক ফার্সী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন এবং লাহোরের মুসলমান শাসনকর্তার অধীনে এক অতি সামান্য চাকুরী

গ্রহণ করেন। গুরুদাসপুরের অধিবাসী মুলার কন্যা সুলখনীর সহিত নানকের বিবাহ হয়। কিন্তু সংসারের সুখ-ভোগের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। কথিত আছে যে, একদিন নানক বনে চলিয়া যান এবং তথায় সমাধিস্থ অবস্থায় ঈশ্বরের বাণী শুনিতে পান, "আমি ভগবান পরমব্রহ্ম ও তুমি ঈশ্বর-প্রেরিত গুরু"। ইহার পর নানক তীর্থভ্রমণে বাহির হন এবং মক্কা, মদিনা, বাগদাদ, সিংহল প্রভৃতি বহির্ভারতীয় তীর্থস্থানগুলি দর্শন করেন। ভারতে তিনি কামরূপ, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলি দর্শন করেন। ভ্রমণের শেষে গুরু কার্তারপুরে আসিয়া বসবাস করেন ও ধর্ম প্রচার করেন।

গুরু নানকের ধর্মের মূল কথা ছিল এক ঈশ্বর, গুরু ও নামজপ। তিনি স্বর্গ, নরক, কর্মফল ও ধর্মাচরণে পাপক্ষয় বিশ্বাস করিতেন। তিনি হিন্দু ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান, জাতিভেদ ও মূর্তিপূজার নিন্দা করিতেন। তিনি এই বাণী প্রচার করেন যে হিন্দু ও মুসলমান অভিন্ন, ঈশ্বর এক এবং ঈশ্বরপ্রেমই মোক্ষলাভের একমাত্র সোপান। নানকের শিষ্যদের মধ্যে বহু মুসলমান ছিলেন। তিনি বেদ ও কোরাণের উপর মোটেই গুরুত্ব আরোপ করিতেন না। তিনি পরমব্রহ্মের উপাসনার উপদেশ দেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে গুরু বিনা আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না। তাঁহার রচিত কতকগুলি দোঁহা আদিগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি শিষ্য অঙ্গদকে পরবর্তী গুরু বলিয়া মনোনীত করেন। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নানক দেহত্যাগ করেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্মমত **শিখধর্ম** নামে পরিচিত।

ধর্মমত

রামদাস ঃ মহারাষ্ট্রের খ্যাতনামা ধর্ম সংস্কারক গুরু রামদাস ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে জম্ব নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সূর্যজীপন্ত ও মাতা রাণুবাঈ। রামদাস ছিলেন তুকারামের সমসাময়িক। তিনি ছিলেন ক্ষাত্রবীর্যে বিশ্বাসী। বার বৎসর বয়সে তাঁহাকে বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু রামদাস বিবাহবাসর হইতে পলায়ন

করিয়া গোদাবরীর তীরে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হন। তিনি ছিলেন রামভক্ত। তিনি সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করেন এবং বহুস্থানে মারুতি (হনুমান) মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দাসবোধ নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ছত্রপতি শিবাজীর গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন। মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক জাগরণে রামদাসের শিক্ষা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়। তাঁহার শিষ্যেরা এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। তিনি একাধারে ছিলেন ধর্মগুরু ও রাজনীতিজ্ঞ। রামদাস মহারাষ্ট্রবাসীদের সামাজিক জীবনেও প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি বহু স্থানে মঠ নির্মাণ করিয়া ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন চালান। জীবনের শেষের দিকে তিনি সাতারায় চলিয়া যান। তিনি রামায়ণের কিছু অংশ অনুবাদ করেন এবং মানুষের পক্ষে কি করণীয় ও কেন করণীয় সে বিষয়ে প্রায় ২০০টি কবিতা রচনা করেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শম্ভুজীর উদ্দেশ্যে তিনি যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে বহু মূল্যবান উপদেশ ছিল। তাঁহার রচিত ভক্তিমূলক কবিতা আজও মহারাষ্ট্রে বহুল প্রচলিত। তিনি রামদাসী পন্থার প্রবর্তক। ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে রামদাস দেহত্যাগ করেন।

অনুশীলনী

১। ভক্তিবাদ ও সুফীবাদ বলিতে কি বুঝায়? এই দুই ধর্মীয় আন্দোলন সম্বন্ধে কি জান?
২। রামানন্দ কে ছিলেন? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান?
৩। কবীরের ধর্মোপদেশ কি ছিল?
৪। চৈতন্যের জীবনী সম্বন্ধে কি জান? তাঁহার ধর্মোপদেশ কি ছিল?
৫। শিখধর্মের প্রবর্তক কে ছিলেন? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান?
৬। গুরু রামদাসের জীবনী সংক্ষেপে লিখ।

নবম অধ্যায়

ভারতে মোগল রাজত্ব

সুলতানী রাজত্বের পর ভারতে মোগল রাজত্ব শুরু হয়। মোঙ্গ শব্দ হইতে **মোঙ্গল** কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার অর্থ নির্ভীক। পুনরায় মোঙ্গল শব্দ হইতে **মোগল** বা **মুঘল** কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে।

মোগল জাতির পরিচয়

বর্তমান মোঙ্গলিয়া ছিল মোঙ্গল জাতির আদি বাসভূমি। মোঙ্গলিয়া হইতে চলিয়া আসিয়া মধ্য এশিয়ার পশ্চিম অঞ্চলে বসবাস করার সময় হইতে উহারা মোগল নামে অভিহিত হয়। ভারতের ইতিহাসে মোঙ্গলগণ মোগল বা মুঘল নামেই পরিচিত হয়। মোগলদের বলা হয় **চাঘতাই তুর্কী**। ইহাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল পশুপালন ও মৃগয়া। ইহারা ছিল দুর্ধর্ষ ও নির্ভীক।

বাবর (১৫২৬-১৫৩০ খ্রীঃ) ঃ ভারতে নূতন তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জহির-উদ্দিন মহম্মদ বাবর। তিনি ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাবর মাতার দিক হইতে চিঙ্গিজ খাঁ ও পিতার দিক হইতে তৈমুরলঙ্গের বংশধর ছিলেন। তাঁহার পিতা ছিলেন রুশ-তুর্কীস্থানের অন্তর্গত ফারগানা নামক স্থানের অধিপতি। তাঁহার পিতার নাম ছিল ওমর শেখ মীর্জা। বারো বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইলে বাবরের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। আত্মীয়-স্বজনের শত্রুতার ফলে বাবর ফারগানা হইতে বিতাড়িত হন। রাজ্যচ্যুত ও গৃহচ্যুত হইয়া বাবর দেশ-দেশান্তরে ঘুরিতে থাকেন। কিন্তু তিনি ছিলেন নির্ভীক ও সংকল্পে অটুট। তিনি কিছু সংখ্যক অনুচর লইয়া সমরকন্দ জয় করেন এবং ফারগানা পুনরুদ্ধার করেন।



বাবর

কিন্তু শীঘ্রই সমরকন্দের উজবেগ সর্দার সাহেবাণী খাঁ-র নিকট পরাজিত হইলে সমরকন্দ ও ফারগানা বাবরের হস্তচ্যুত হয়। কিন্তু তিনি নিরাশ হইবার পাত্র ছিলেন না। ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে বাবর অতি অল্প সংখ্যক অনুচর হইয়া কাবুল দখল করেন। বাবরের ভাগ্য ক্রমেই সুপ্রসন্ন হইতে থাকে। ইহার পর তিনি ভারত জয় করিতে উদ্যোগী হন। সেই সময় দিল্লীর সুলতান ছিলেন ইব্রাহিম লোদী। সুলতানের বিরুদ্ধে দিল্লীর আমীরগণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ-র আমন্ত্রণে বাবর ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া লাহোর দখল করেন। দুই বৎসর পরে (১৫২৬ খ্রীঃ) বাবর দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলে ইব্রাহিম লোদী তাঁহাকে বাধা দেন। পাণিপথের প্রান্তরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। ইব্রাহিম লোদী পরাজিত হইয়া নিহত হন। এই যুদ্ধ ইতিহাসে **পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ** নামে খ্যাত। বাবর দিল্লী ও আগ্রা দখল করেন। এইভাবে দিল্লীর তুর্ক-আফগান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

বাবর রাজ্যজয়ে মনোযোগী হন। অল্প সময়ের মধ্যে কালপি, বায়ানা ও জৌনপুর মোগলদের হস্তগত হয়। কিন্তু মেবারের রাণা **সংগ্রাম সিংহ** বাবরকে বাধা দেন। সেই সময় রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে মেবার ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। রাণা সংগ্রাম সিংহ ছিলেন বিচক্ষণ এবং শৌর্য-বীর্যের অধিকারী। যোদ্ধা ও শাসক হিসাবে মধ্য ভারতে ও গুজরাটে সংগ্রাম সিংহের খুব খ্যাতি ছিল। এমন কি সংগ্রাম সিংহের শত্রু বাবরও রাণার যশ ও বীরত্বের কথা স্বীকার করিয়াছেন। বাবর কালপি, বায়ানা প্রভৃতি অঞ্চল দখল করিলে সংগ্রাম সিংহ বাবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে বাবরও সংগ্রাম সিংহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ইতিপূর্বে বাবর আফগান ও তুর্কীদের সহিত বহু যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজপুতদের বীরত্বের সহিত তাঁহার কোন পরিচয় তখনও হয় নাই। সংগ্রাম সিংহ এক দুর্ধর্ষ রাজপুত বাহিনী লইয়া বাবরের সম্মুখীন হন।

রাজ্য জয়

সংগ্রাম সিংহের প্রতিরোধ ও পরাজয়

খানুয়ার প্রান্তরে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। প্রথম দিকে সংগ্রাম সিংহ জয়লাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত তিনি পরাজিত হন। এই যুদ্ধ খানুয়ার যুদ্ধ নামে খ্যাত। সংগ্রাম সিংহ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া এক দুর্গম পার্বত্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধের ফলে মোগলদের বিরুদ্ধে রাজপুতদের প্রতিরক্ষা-সংঘ ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইহার দুই বৎসর পর ঘর্ঘরা নদীর তীরে বাবর বাংলা ও বিহারের সম্মিলিত আফগান বাহিনীকে পরাস্ত করেন। ইহার ফলে মোগল সাম্রাজ্যের সীমানা বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হয়।

এশিয়ার ইতিহাসে বাবরের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনি ছিলেন অসাধারণ দৈহিক শক্তির অধিকারী, উদ্যোগী ও আত্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী। আত্মবিশ্বাস ও দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা তাঁহার সাফল্যের প্রধান কারণ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবোধ, সঙ্গীতানুরাগ ও বিদ্যানুরাগ প্রভৃতি গুণেরও তিনি অধিকারী ছিলেন। তাঁহার পিতৃস্নেহ ছিল অপরিসীম। কথিত আছে যে এক সময় পুত্র হুমায়ুন কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলে বাবর নিজের প্রাণের বিনিময়ে ঈশ্বরের নিকট হুমায়ুনের প্রাণভিক্ষা করিয়াছিলেন। হুমায়ুন ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিলে বাবর নিজেই অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং অবশেষে প্রাণত্যাগ করেন। বাবর ছিলেন সুকবি। তাঁহার আত্মজীবনী (**বাবরনামা**) মধ্য যুগের ইতিহাস ও সাহিত্যের এক অমূল্য গ্রন্থ।

চরিত্র

হুমায়ুন (১৫৩০-৪০ ; ১৫৫৬ খ্রীঃ) ঃ বাবরের পরবর্তী মোগল সম্রাট **হুমায়ুন** ছিলেন পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র। তাঁহার মাতার নাম ছিল মহিম বেগম। হুমায়ুন তুর্কী, আরবী ও ফার্সী ভাষায় যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই হুমায়ুন নানা বিপত্তির সম্মুখীন হন। পিতার নির্দেশ অনুসারে হুমায়ুন তাঁহার তিন ভ্রাতার মধ্যে পিতৃ-রাজ্য ভাগ করিয়া দেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতারা (কামরাণ, মীর্জা হিন্দল ও আসকরী) নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন থাকিয়া হুমায়ুনের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তোলেন। দিল্লীর

হুমায়ুনের বিপত্তি

সিংহাসন দখল করার জন্য কামরাণ কাবুল হইতে যাত্রা করেন এবং পাঞ্জাব দখল করেন। কিন্তু হুমায়ুন ভ্রাতার এই ব্যবহার নীরবে সহ্য করেন। এদিকে গুজরাটের বাহাদুর শাহ দিল্লী আক্রমণের সংকল্প করিলে হুমায়ুন গুজরাট আক্রমণ করিয়া তাহা দখল করেন। কিন্তু শীঘ্রই হুমায়ুন বিহারের আফগান জায়গীরদার শের খাঁ-কে দমন করিতে অগ্রসর হন। সেই সুযোগে বাহাদুর শাহ গুজরাট পুনরুদ্ধার করেন।


হুমায়ুন

বাবর আফগানদের দমন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু উহাদের শক্তিহীন করিতে পারেন নাই। হুমায়ুনের দুর্বলতার সুযোগে আফগান সর্দারগণ মোগল সাম্রাজ্যের বিরোধিতা শুরু করেন। ইহাদের মধ্যে বিহারের শের খাঁ ছিলেন প্রধান। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শের খাঁ বিহারে নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া বাংলা দখল করেন। হুমায়ুন শের খাঁ-র বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। পথে চূণার দখল করিয়া হুমায়ুন বাংলা আক্রমণ করেন। শের খাঁ হুমায়ুনকে বাধা না দিয়াই বাংলা ত্যাগ করেন। হুমায়ুন বাংলার রাজধানী গৌড়ে যখন আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত, সেই সুযোগে শের খাঁ বারাণসী, জৌনপুর ও কনৌজ দখল করেন। এই সংবাদে হুমায়ুন শের খাঁ-র বিরুদ্ধে পুনরায় অগ্রসর হন এবং চৌসা নামক স্থানে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। হুমায়ুন পরাজিত হন। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজের নিকট উভয় পক্ষে পুনরায় যুদ্ধ হয়। হুমায়ুন পরাজিত হইয়া দেশত্যাগী হন, শের খাঁ দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। আশ্রয়ের সন্ধানে হুমায়ুন শেষ পর্যন্ত পারস্যে গমন করেন।

শের খাঁর নিকট পরাজয় ও দেশত্যাগ

পারস্যের সাহায্যে হুমায়ুন ভারতের দিকে অগ্রসর হন। পথে তিনি কাবুল ও কান্দাহার দখল করেন। ইতিমধ্যে শের শাহের

মৃত্যুর পর ভারতে আফগান শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। হুমায়ুন লাহোর দখল করিয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন। সিকন্দর শূরকে পরাজিত করিয়া হুমায়ুন দিল্লী ও আগ্রা পুনরায় দখল করেন (১৫৫৫ খ্রীঃ)। এই ভাবে পনের বৎসর পর হুমায়ুন মোগল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুনের মৃত্যু হয়।

দয়া-দাক্ষিণ্য এবং স্নেহপ্রবণতা ছিল হুমায়ুনের চরিত্রের মহৎ গুণ। তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও অমায়িক। বহু বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। তাঁহার চরিত্রের সর্বাধিক ত্রুটি ছিল অতিরিক্ত অহিফেন সেবন।

শূরবংশ : শেরশাহ (১৫৪০-৪৫ খ্রীঃ) : প্রথমে শেরশাহের নাম ছিল ফরিদ খাঁ। তাঁহার পিতা হাসান ছিলেন বিহারের অন্তর্গত সাসারামের জায়গীরদার। হাসান ছিলেন শূর বংশীয় আফগান। এই কারণে শের-শাহের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ শূরবংশ নামে পরিচিত ছিল। ফরিদের বাল্য জীবন সুখের ছিল না। বিমাতার দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি গৃহত্যাগী হন। তিনি বিহারের শাসনকর্তা বাহার খাঁ ও তাঁহার পুত্র জালাল খাঁ-র অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। এক সময় ফরিদ অসির আঘাতে এক ব্যাঘ্র হত্যা করিলে বাহার খাঁ প্রীত হইয়া তাঁহাকে **শের খাঁ** উপাধি প্রদান করেন। বাহার খাঁ-র মৃত্যুর পর ফরিদ জালাল খাঁ-র অভিভাবক নিযুক্ত হন। জালাল খাঁ ছিলেন নাবালক, সেই সুযোগে শের খাঁ নিজের শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। অবশেষে তিনি জালাল খাঁ-র বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া বিহার দখল করেন। ইহার পর শের খাঁ বাংলা আক্রমণ করিয়া গৌড় দখল করেন। এই সংবাদে মোগল সম্রাট হুমায়ুন শের খাঁ-র বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। চৌসা ও কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুন শের খাঁ-র নিকট পরাজিত হইয়া ভারত পরিত্যাগ করেন।

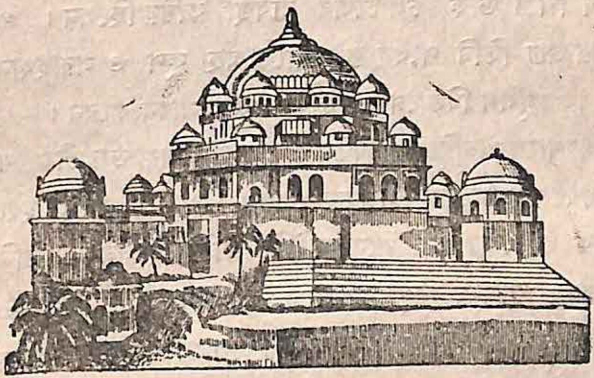


শেরশাহ

শের খাঁ দিল্লীর সিংহাসন দখল করিয়া শেরশাহ উপাধি ধারণ করেন। এই ভাবে দিল্লীতে শূর বংশের রাজত্ব শুরু হয়।

রাজ্য বিস্তার

দিল্লী, আগ্রা, বিহার ও জৌনপুর দখল করিয়া শেরশাহ রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হন। শীঘ্রই তিনি পাঞ্জাব, মুলতান, সিন্ধুদেশ, মালব ও উজ্জয়িনী দখল করেন। ইহার পর তিনি কালিঞ্জরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কালিঞ্জরের দুর্গ অবরোধ কালে এক বিস্ফোরণের ফলে শের শাহের মৃত্যু হয় (১৫৪৫ খ্রীঃ)।



শেরশাহের সমাধি

শেরশাহের শাসনব্যবস্থা ঃ শেরশাহ ছিলেন সুদক্ষ শাসক। স্বেচ্ছাতন্ত্রে বিশ্বাসী হইয়াও তিনি ছিলেন প্রজাকল্যাণকামী শাসক। সুলতান ছিলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। কেন্দ্রের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য চারিজন মন্ত্রী নিযুক্ত ছিলেন, যথা—দেওয়ানে-উজীরাৎ, দেওয়ানে আর্জ, দেওয়ানে-রিয়াসৎ ও দেওয়ানে-ইন্‌সা। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য শেরশাহ সাম্রাজ্যকে ৪৭টি সরকার বা ভাগে বিভক্ত করেন। প্রত্যেকটি সরকার কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত ছিল। পরগণার কর্মচারীদের মধ্যে শিকদার, আমিন ও মুন্‌সিফ উল্লেখযোগ্য। গ্রামের শাসনভার পঞ্চায়েতের উপর অর্পিত ছিল। শেরশাহের রাজস্ব-সংক্রান্ত সংস্কার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। রাজস্ব

নির্ধারণের জন্য তিনি জমি জরিপ করিবার প্রথা চালু করেন। রাষ্ট্র ও প্রজার স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি 'পাট্টা' ও 'কবুলিয়ৎ' নামে দুই প্রকার দলিলের প্রবর্তন করেন। উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ রাজকর হিসাবে ধার্য করেন। শেরশাহ বিচার ও পুলিশ ব্যবহার সংস্কার করেন। সুলতান ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক। দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের ভার কাজী ও মীর-আদল নামে কর্মচারীর হস্তে ন্যস্ত থাকিত। শেরশাহ বহু রাস্তাঘাট নির্মাণ করিয়া যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য ঘোড়ার পিঠে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পথিকদের সুবিধার জন্য তিনি পথের দুই পার্শ্বে বহু কূপ ও সরাইখানা নির্মাণ করেন। পুলিশ বিভাগেরও তিনি সংস্কার সাধন করেন।

শেরশাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ মধ্য যুগের ভারতীয় শাসকদের মধ্যে শেরশাহ ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ। সামান্য অবস্থা হইতে তিনি নিজেকে ভারতের সম্রাটপদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সুচতুর, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও নিষ্ঠাবান সুন্নী মুসলমান। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন না। রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ ছিল মহান। নানাবিধ প্রজাকল্যাণমূলক কার্য তাঁহার রাজত্বকালকে গৌরবদান করিয়াছে। রাজত্বের সমগ্র সময় যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়াও তিনি শাসন দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীঃ) ঃ পিতা হুমায়ুনের এক দুঃসময়ে হামিদাবানু বেগমের গর্ভে আকবরের জন্ম হয় (১৫৪২ খ্রীঃ)। পারস্যের পথে পলায়ন কালে ভ্রাতা আসকরীর আক্রমণের সংবাদে ভীত হইয়া হুমায়ুন নবজাত শিশু আকবরকে ফেলিয়া যান। আসকরী শিশুটিকে কুড়াইয়া লইয়া লালন-পালন করেন। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন আকবরকে উদ্ধার করেন। শৈশবে আকবরের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু লেখাপড়া অপেক্ষা খেলাধূলা ও পশু শিকারের প্রতি আকবরের আকর্ষণ ছিল বেশী। ১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুনের ভ্রাতা হিন্দলের কন্যা রাকিয়া বেগমের সহিত আকবরের

বাল্য জীবন

বিবাহ হয়। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিলে আকবরকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। হুমায়ুনের বিশ্বস্ত অনুচর **বৈরাম খাঁকে** আকবরের অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুনের মৃত্যু হইলে বৈরাম খাঁ আকবরকে ভারতের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন।


আকবর

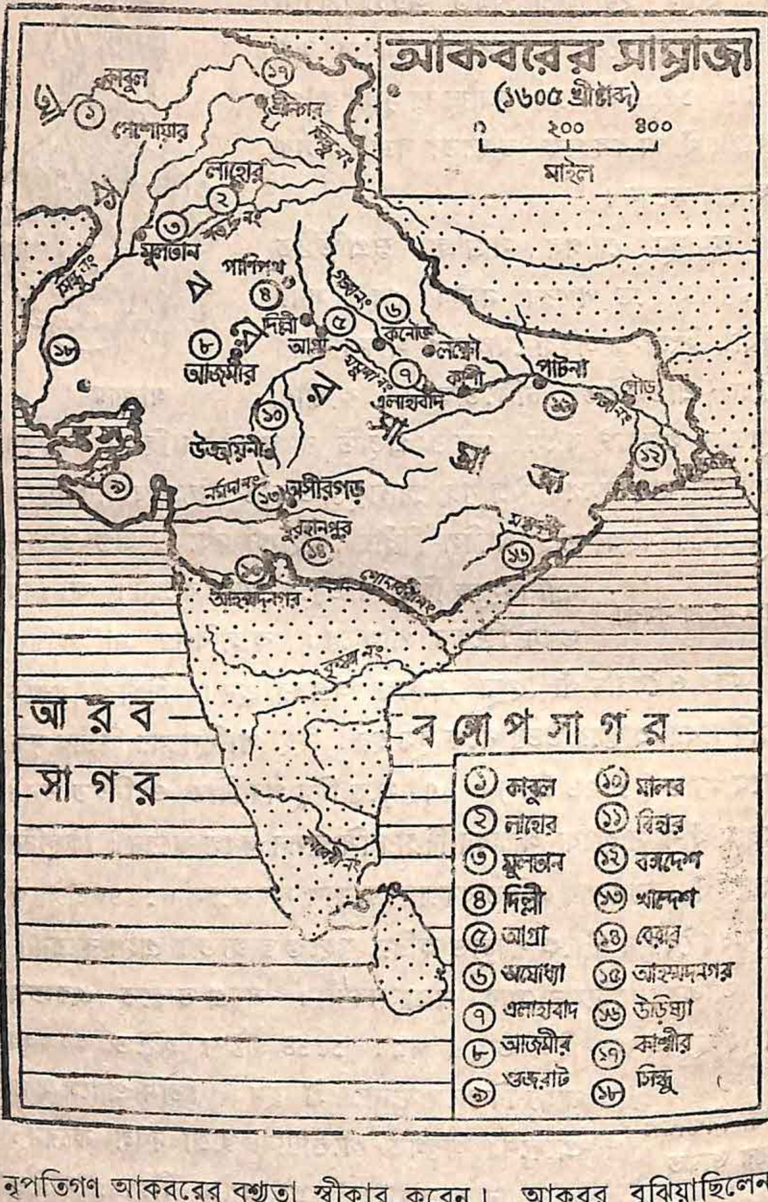
হুমায়ুন মোগল সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। সেই সময় দিল্লীর সিংহাসন লইয়া মোগল ও আফগানদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। কাশ্মীর, মুলতান, গুজরাট, বাংলা, মেবার প্রভৃতি রাজ্য স্বাধীন ছিল। দক্ষিণ ভারতের আহম্মদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি রাজ্যও স্বাধীন ছিল। শূর বংশীয় মহম্মদ শাহ আদিল দিল্লীর সিংহাসন দখলের জন্য তাঁহার মন্ত্রী হিমুকে দিল্লী অভিমুখে প্রেরণ করেন। আকবর তখন ছিলেন পাঞ্জাবে। কালবিলম্ব না করিয়া আকবর ও বৈরাম খাঁ হিমুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। দিল্লীর নিকটে পাণিপথের প্রান্তরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। ইহা **পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ** নামে খ্যাত (১৫৫৬ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে হিমু পরাজিত ও নিহত হন। বৈরাম খাঁ-র সাহায্যে আকবর দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। কিছুদিন বৈরাম খাঁ আকবরের অভিভাবকরূপে রাজ্যশাসন করেন। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বৈরাম খাঁকে পদচ্যুত করিয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

আকবরের সমস্যা

আকবর ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। সমগ্র ভারতে একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপন করা ছিল তাঁহার স্বপ্ন। ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আকবর রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হন। তিনি প্রথমে মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত গণ্ডোয়ানা রাজ্য দখল করেন। গণ্ডোয়ানার **রাণী দুর্গাবতী** অসীম বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হন।

রাজ্য বিস্তার : উত্তর ভারত

ইহার পর আকবর রাজপুত রাজ্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। একে একে যোধপুর, জয়সলমীর, বুঁদি প্রভৃতি রাজ্যের রাজপুত



নৃপতিগণ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। আকবর বুঝিয়াছিলেন যে দুর্ধর্ষ রাজপুতদের সাহায্য ব্যতীত মোগল সাম্রাজ্য শক্তিশালী ও

দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। তাই তিনি রাজপুত কন্যা বিবাহ করিয়া রাজপুতদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। কিন্তু মেবারের রাণা উদয় সিংহ আকবরের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে বা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিতে অসম্মত হন। ফলে আকবর মেবার আক্রমণ করেন (১৫৬৭ খ্রীঃ)। উদয় সিংহ পলায়ন করেন এবং মোগল বাহিনী মেবারের রাজধানী চিতোর দখল করে। কিন্তু শীঘ্রই উদয় সিংহের পুত্র রাণা প্রতাপ মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। সেই সময় রাণা প্রতাপ ছিলেন রাজপুত রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ছিলেন সুনিপুণ যোদ্ধা ও তাঁহার দেশপ্রেম ছিল গভীর। জনৈক ইংরাজ ঐতিহাসিক (স্মিথ) প্রতাপের প্রশংসা করিয়া বলেন, "মোগলদের নিকট প্রতাপের অপরাধ ছিল তাঁহার স্বদেশ প্রেম"। রাণা প্রতাপ ছিলেন দুঃসাহসী। সেই সময় চিতোর ছিল মোগলদের হস্তগত। মোগলদের তুলনায় প্রতাপের যুদ্ধোপকরণও ছিল নিতান্তই নগণ্য। কিন্তু দুর্দমনীয় স্বাধীনতা স্পৃহাই ছিল তাঁহার একমাত্র সম্বল।



রাণা প্রতাপ

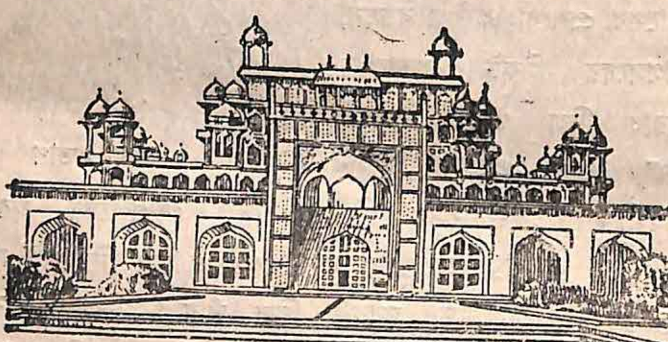
হলদিঘাটের যুদ্ধ

মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিতে অসম্মত হইলে রাজা মানসিংহ ও আকবরের পুত্র সেলিমকে রাণার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হলদিঘাট নামক স্থানে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। ইহা **হলদিঘাটের যুদ্ধ** নামে খ্যাত। বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াও রাণা প্রতাপ পরাজিত হন। তিনি দুর্গম পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রতাপ নিরাশ হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি দীর্ঘ কুড়ি বৎসর মেবার উদ্ধারের জন্য মোগলদের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যান। ইতিহাসে প্রতাপের বীরত্বের খ্যাতি আজও অমর হইয়া আছে।

ইহার পর আকবর একে একে গুজরাট, কাবুল, কাশ্মীর, বাংলা, উড়িষ্যা ও সিন্ধুদেশ জয় করেন।

উত্তর ভারত বিজয় সম্পন্ন করিয়া আকবর দাক্ষিণ ভারত বিজয়ে যত্নবান হন। এই সময় দক্ষিণ ভারতে চারিটি প্রধান মুসলমান রাজ্য ছিল, যথা— আহম্মদনগর, গোলকুণ্ডা, বিজাপুর ও খান্দেশ। খান্দেশের সুলতান বিনা যুদ্ধে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু অপর তিন সুলতান বশ্যতা স্বীকারে অসম্মত হইলে তাঁহাদের বিরুদ্ধে মোগল বাহিনী প্রেরণ করা হয়। আহম্মদনগর মোগলদের হস্তগত হয়। সম্রাট আকবর স্বয়ং খান্দেশের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং অসীরগড় দুর্গ অবরোধ করেন। ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে অসীরগড় মোগলদের হস্তগত হয়। অসীরগড় আকবরের শেষ রাজ্যজয়। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যু হয়।

দক্ষিণ ভারত



আকবরের সমাধি

আকবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ আকবর ছিলেন মধ্যযুগে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁহার দৈহিক শক্তি ও সাহস ছিল অসীম। তাঁহার স্বভাব ছিল গাম্ভীর্যপূর্ণ, সরল ও অমায়িক। তিনি একাধারে ছিলেন নির্ভীক যোদ্ধা, সেনাপতি ও প্রজাকল্যাণকামী শাসক। তিনি নিজে ছিলেন নিরক্ষর। কিন্তু তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা ছিল অপরিসীম। তিনি ছিলেন সঙ্গীত-প্রিয়। মিঞা তানসেন ছিলেন তাঁহার সভা-গায়ক। শিল্পকলার প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল প্রবল।

ফতেপুর সিক্রী, হুমায়ুনের সমাধি ও জাহাঙ্গীর মহল আকবরের স্থাপত্য কীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

আকবর ছিলেন রাজনীতিজ্ঞ ও দূরদর্শী। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ভারতে সাম্রাজ্য গঠন করিতে হইলে হিন্দুদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। এই কারণে তিনি রাজপুতদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া এবং রাষ্ট্রের উচ্চপদে নিয়োগ করিয়া উহাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুদের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করিতেন। তিনি হিন্দুদের উপর হইতে জিজিয়া কর, তীর্থ কর প্রভৃতি উঠাইয়া দিয়া হিন্দুদের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। এক কথায় আকবর ছিলেন ভারতের সর্বপ্রথম জাতীয় সম্রাট।

আকবর ছিলেন সত্যানুসন্ধী। সকল ধর্মের সারমর্ম জানিবার জন্য তিনি ফতেপুর সিক্রীতে **ইবাদৎখানা** নামে একটি ধর্মালোচনা গৃহ নির্মাণ করেন। তিনি হিন্দু, জৈন, পার্সী খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মের আচার্যদের তথায় আমন্ত্রণ করিয়া ধর্মীয় আলোচনা শুনিতেন। আকবর **দিন-ইলাহি** নামে এক নূতন একেশ্বরবাদী ধর্মমতের প্রচার করেন। সকল ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই এই ধর্মমতের উদ্দেশ্য ছিল। আকবরের ধর্মমতের মূল কথাই ছিল **সুল্‌হে কুল** অর্থাৎ পরধর্ম সহিষ্ণুতা।

জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৭খ্রীঃ): আকবরের পর তাঁহার পুত্র সেলিম জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাল্যকালে জাহাঙ্গীরকে আরবী, ফার্সী, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। রাজা ভগবান দাসের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর জাহাঙ্গীর শের আফগান নামে বাংলার এক জায়গীরদারের স্ত্রী নূরজাহানকে বিবাহ করেন। নূরজাহান ('জগতের আলো') ছিলেন অসামান্যা রূপবতী ও বিদুষী।

পিতার ন্যায় জাহাঙ্গীরও ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী। তিনি মেবারের বিরুদ্ধে তিনবার অভিযান প্রেরণ করেন। প্রথম দুইটি অভিযান ব্যর্থ হয়। যুবরাজ খুরমের (শাহ্‌জাহান) অধীনে তৃতীয়বার অভিযান প্রেরণ করা হয়। এইবার মেবারের রাণা অমর সিংহ পরাজিত হন

এবং মোগলদের সহিত সন্ধি করেন। ইহার পর বাংলার স্বাধীন জমিদার বা ভুঁইয়াদের বিরুদ্ধে মোগল অভিযান শুরু হয়। একে একে মুশা খাঁ, রাজা প্রতাপাদিত্য ও উসমান পরাজিত হইলে সমগ্র বাংলায় মোগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজ্য বিস্তার



জাহাঙ্গীর



নূরজাহান

জাহাঙ্গীর দাক্ষিণাত্য বিজয়েও উদ্যোগী হন। যুবরাজ খুরমের অধীনে দাক্ষিণাত্য অভিযান শুরু হয়। একে একে আহম্মদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানগণ পরাজিত হইয়া সম্রাটকে বাৎসরিক কর প্রদানে স্বীকৃত হন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পারস্যের সহিত মোগলদের সংঘর্ষ শুরু হয়। পারস্য-সম্রাট মোগলদের হস্ত হইতে কান্দাহার অধিকার করিয়া লন।

দাক্ষিণাত্য অভিযান

জাহাঙ্গীর আকবরের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে কতকগুলি গুণের সমাবেশ দেখা যায়। তিনি ছিলেন আত্মবিশ্বাসী ও নিরপেক্ষ বিচারক। রাজ্যের নিম্নতম প্রজাও সরাসরি সম্রাটের বিচার-প্রার্থী হইতে পারিত। তিনি ষাটটি ঘণ্টা-যুক্ত একটি সোনার শিকল আগ্রা দুর্গের

চরিত্র

বাহিরে ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন। যে কোন বিচার-প্রার্থী ঐ শিকলটি নাড়িয়া সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিত। ন্যায়পরায়ণ, স্নেহশীল ও অমায়িক হওয়া সত্ত্বেও তিনি মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর কাজ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। জাহাঙ্গীর ছিলেন বিদ্যানুরাগী। শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল প্রবল। তাঁহার আত্মচরিত **তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরি** গ্রন্থে তাঁহার শিল্পানুরাগ ও সাহিত্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

শাহজাহান (১৬২৭-৫৮ খ্রীঃ) ঃ জাহাঙ্গীরের পর তাঁহার তৃতীয় পুত্র শাহজাহান সিংহাসনে আরোহণ করেন।

রাজত্বের প্রথম দিকে শাহজাহানকে কতকগুলি বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয়। বুন্দেলখণ্ডের রাজা ঝুজর সিংহ বিদ্রোহী হন। শাহজাহান কঠোর হস্তে ইহা দমন করেন। ইহার পর দাক্ষিণাত্যের মোগল শাসনকর্তা খানজাহান লোদী বিদ্রোহী হন। ইহাও কঠোর হস্তে দমন করা হয়। সে সময় পর্তুগীজরা বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছিল। কিন্তু উহাদের ঔদ্ধত্যে শাহজাহান অত্যন্ত রুষ্ট হন। তিনি পুর্তুগীজগণকে হুগলী হইতে বিতাড়িত করার আদেশ দেন। তিন মাস যুদ্ধ চলিবার পর পর্তুগীজগণ বাংলা হইতে বিতাড়িত হয় (১৬৩২ খ্রীঃ)।

বিদ্রোহ দমন



শাহজাহান

পিতা ও পিতামহের ন্যায় শাহজাহানও রাজ্য বিস্তারের নীতি অনুসরণ করেন। শাহজাহান ছিলেন সুন্নী মুসলমান। দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণ ছিলেন সিয়া মুসলমান। সুতরাং সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের সিয়া সম্প্রদায়ের ধ্বংস সাধন করাই শাহজাহানের উদ্দেশ্য ছিল। গোলকুণ্ডার সুলতান মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু বিজাপুরের সুলতান তাহা করিতে অসম্মত হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে মোগলবাহিনী প্রেরণ করা

দাক্ষিণাত্য বিজয়

হয়। বিজাপুরের সুলতান পরাজিত হইয়া সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। সম্রাটের তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেবকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়।

শাহজাহানের শেষ জীবন ছিল দুঃখময়। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাঁহার চারি পুত্রের (দারাশিকো, সুজা, ঔরঙ্গজেব, মুরাদ) মধ্যে সিংহাসনের প্রশ্ন লইয়া সংঘর্ষ শুরু হয়। সুজা, ঔরঙ্গজেব ও মুরাদ দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন। সামুগড়ের যুদ্ধে ঔরঙ্গজেব দারাকে পরাস্ত করিয়া আগ্রায় প্রবেশ করেন। তাঁহার আদেশে বৃদ্ধ পিতা শাহজাহান ও ভগিনী জাঁহানারাকে বন্দী করা হয়। পরে দারা ও মুরাদকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব

শাহজাহান ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, উদ্যমী, বুদ্ধিমান ও স্নেহপ্রবণ। তিনি ছিলেন বিদ্বান ও বিদ্যার প্রতি অনুরাগী এবং অত্যন্ত আড়ম্বর প্রিয়। আরবী, ফার্সী ও হিন্দীভাষায় তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। সেযুগের বহু খ্যাতনামা কবি, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি বহু বিদ্যালয় নির্মাণ করিয়াছিলেন। এগুলির মধ্যে **দার-উল-বাকা** নামে মাদ্রাসা ও দিল্লীর রাজ-কলেজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার চরিত্রে নিষ্ঠুরতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন হিন্দু-বিদ্বেষী ও সিয়া-বিদ্বেষী। ধর্মের ক্ষেত্রেও শাহজাহানের নৃশংসতার পরিচয় পাওয়া যায়।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

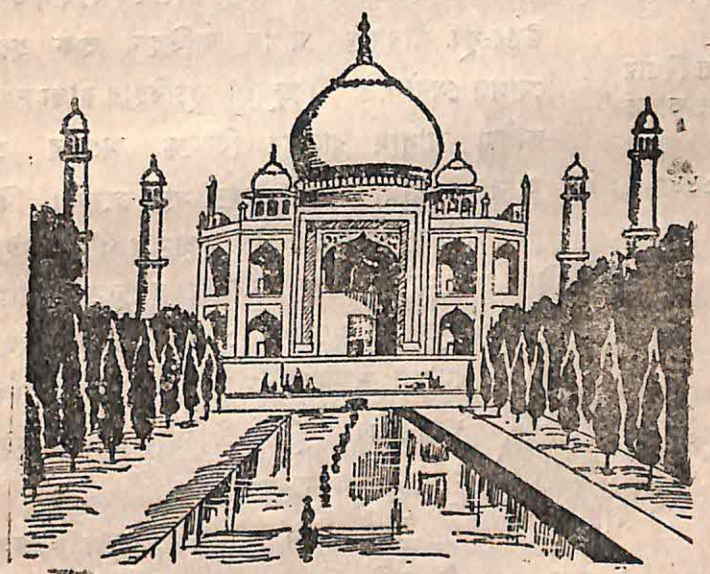
কৃতিত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে শাহজাহানের রাজত্বকালকে মোগল শাসনের সুবর্ণ যুগ বলা যায়। শাহজাহানের আমলেই দক্ষিণ-ভারতে মোগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার আমলেই পর্তুগীজদের দমন করিয়া উহাদের প্রতিপত্তি বিনষ্ট করা হয় এবং পূর্ব-ভারতে মোগল সাম্রাজ্য কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

শাহজাহানের রাজত্বকাল শিল্পোন্নতি, জাঁকজমক এবং বিলাসিতার জন্য প্রসিদ্ধ। সম্রাট নিজেই ছিলেন বিলাসী ও জাঁকজমকপ্রিয়।

তাঁহার মুকুটে শোভা পাইত জগদ্বিখ্যাত কোহিনূর হীরক। মণিমুক্তা-খচিত ময়ূরসিংহাসনটিও শাহজাহানের আড়ম্বরপ্রিয়তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শাহজাহান ছিলেন স্থাপত্য শিল্পের পরম পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার স্থাপত্য সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হইল **তাজমহল**। বহু দেশী ও বিদেশী শিল্পীদের চেষ্টায় ইহা নির্মিত হইয়াছিল। তিন কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে বাইশ বৎসরে


মমতাজ

তাজমহল নির্মিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া **মতিমহল**, **শিশমহল**, **দেওয়ানে আম**, **দেওয়ানে খাস** প্রভৃতি অপূর্ব সৌধগুলি তিনি নির্মাণ


তাজমহল

করিয়াছিলেন। শাহজাহানের আমলে চিত্রশিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

ঔরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ) ঃ মোগল সাম্রাজ্যের শেষ শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন ঔরঙ্গজেব। ভ্রাতৃবিরোধে জয়লাভ করিয়া এবং বৃদ্ধ পিতা শাহজাহানকে গৃহবন্দী করিয়া ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি **আলমগীর পাদশাহ গাজী** উপাধি ধারণ করেন।

ভ্রাতৃবিরোধের ফলে সাম্রাজ্যে নানা অশান্তি দেখা দিয়াছিল। জনসাধারণের দুর্দশার অন্ত ছিল না। প্রজাদের আনুগত্য লাভের জন্য

প্রাথমিক কার্যাদি

ঔরঙ্গজেব করের পরিমাণ কমাইয়া দেন এবং আশী রকমের অবৈধ কর বন্ধ করেন। সুন্নী মুসলমানগণ ছিলেন ঔরঙ্গজেবের প্রবল সমর্থক। সুতরাং উহাদের খুশী করার জন্য তিনি **নওরোজ** (নূতন বৎসর) উৎসব নিষিদ্ধ করেন। **নওরোজ** উৎসব ছিল সিয়া মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব।

আকবরের ন্যায় ঔরঙ্গজেবও সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ঔরঙ্গজেব রাজ্য বিস্তারে যত্নবান হন।

রাজ্য বিস্তার
উত্তর-ভারত

উত্তর-পূর্ব সীমান্তে মোগল অভিযান শুরু হয়। মোগল সেনাপতি মীরজুমলা কুচবিহার রাজ্য দখল করিয়া আসাম রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন (১৬৬৩ খ্রীঃ)। আসামের রাজা পরাজিত হইয়া সন্ধি করেন। কিন্তু মীরজুমলা অসুস্থ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে আসামের রাজা তাঁহার হস্তচ্যুত রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধার করেন। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার মোগল শাসনকর্তা সায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম দখল করেন এবং পর্তুগীজ ফিরিঙ্গীদের নিকট হইতে সন্দ্বীপ দখল করেন।


ঔরঙ্গজেব

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুর্ধর্ষ আফগান উপজাতিগুলি প্রায়ই ভারতে প্রবেশ করিয়া লুঠতরাজ চালাইত। উহাদের দমনের জন্য ঔরঙ্গজেব নিজেই সৈন্য লইয়া পেশোয়ারে উপস্থিত হন। বিদ্রোহী উপজাতিগুলি একে একে পরাজিত হয় এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষিত হয়।

পূর্ববর্তী সম্রাটদের ন্যায় ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যেও রাজ্যবিস্তার করিতে যত্নবান হন। সেই সময় দাক্ষিণাত্যে দুইটি সিয়ারাজ্য ছিল—বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা। ঔরঙ্গজেব নিজেই দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন (১৬৮২ খ্রীঃ) এবং জীবনের শেষ পঁচিশ বৎসর দাক্ষিণাত্যেই অতিবাহিত করেন।

দক্ষিণ-ভারত

ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটাইয়া মারাঠা শক্তির ধ্বংস সাধন করা। পিতার ন্যায় ঔরঙ্গজেবও দাক্ষিণাত্যে সিয়া রাজ্য দুইটির পরম শত্রু ছিলেন। ঔরঙ্গজেব বিজাপুরের সুলতানের নিকট কিছু অশ্বারোহী সৈন্য দাবি করেন। বিজাপুরের সুলতান এই দাবি পূরণ করার পরিবর্তে মারাঠাগণকে তাঁহার সাহায্যে আমন্ত্রণ জানান। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ঔরঙ্গজেব বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিয়া উহার সুলতানকে বন্দী করেন এবং (১৬৮৬ খ্রীঃ) বিজাপুর দখল করেন। বিজাপুরের পর ঔরঙ্গজেব গোলকুণ্ডা আক্রমণ করেন (১৬৮৭ খ্রীঃ) এবং তাহা দখল করেন। এইভাবে দাক্ষিণাত্যের দুইটি সিয়া রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার বিলুপ্তি

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার বিলুপ্তির পর ঔরঙ্গজেব মারাঠাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। সে সময় মারাঠারা দক্ষিণ ভারতে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতে মারাঠাদের নেতৃত্বে হিন্দুশক্তির পুনরুত্থান মোগল সাম্রাজ্যের আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং ঔরঙ্গজেব তাঁহার সকল শক্তি লইয়া মারাঠাদের ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর হন।

মারাঠাদের সহিত সংগ্রাম

দাক্ষিণাত্যে মোগল শাসনকর্তা থাকাকালীন ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে দমন করার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। সম্রাট হইবার পর ঔরঙ্গজেব সায়েস্তা খাঁ-কে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন (১৬৬৩ খ্রীঃ)। সায়েস্তা খাঁ শিবাজীর কয়েকটি দুর্গ দখল করিয়া পুনায় অবস্থান করিতেছিলেন। শিবাজী অতর্কিতে মোগল শিবির আক্রমণ করেন। মোগলবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং সায়েস্তা খাঁ পলায়ন করেন।

ইহার পর মোগল যুবরাজ মুয়াজ্জম ও রাজা জয়সিংহকে শিবাজীর



বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। শিবাজী মোগলদের সহিত পুরন্দরের সন্ধি করেন(১৬৬৫ খ্রীঃ)। জয়সিংহের অনুরোধে শিবাজী আগ্রায় আগমন

করেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেব শিবাজীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন ও তাঁহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কৌশলে আগ্রা হইতে পলায়ন করিয়া শিবাজী নিজ রাজ্যে ফিরিয়া আসেন। শিবাজী মোগল সম্রাটের সহিত শান্তি স্থাপন করেন। ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে রাজা উপাধি প্রদান করেন এবং তাঁহার পুত্র শম্ভুজীকে মোগল মনসবদার পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু মোগলদের সহিত শিবাজীর শান্তি অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মোগল-মারাঠা সংঘর্ষ পুনরায় শুরু হয়। শিবাজীর মৃত্যুর পর (১৬৮০ খ্রীঃ) তাঁহার পুত্র শম্ভুজীর সহিতও মোগলদের যুদ্ধ চলে। শম্ভুজী পরাজিত হইয়া সম্রাটের আদেশে নিহত হন; কিন্তু মোগলদের বিরুদ্ধে মারাঠাদের সংগ্রাম দুর্বার গতিতে চলিতে থাকে। ঔরঙ্গজেব বহু চেষ্টা করিয়াও মারাঠাদের ধ্বংস করিতে ব্যর্থ হন। দাক্ষিণাত্যেই ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়।

ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির ফলাফল

ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘকাল যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে মোগল রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়ে। দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে উত্তর ভারতে মোগল শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ে। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ফলে মোগল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়।

ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি ও উহার ফলাফল: সম্রাট ঔরঙ্গজেব ছিলেন গোঁড়া সুন্নী মুসলমান। ভারতকে **দার-উল-ইসলামে** (ইসলামের দেশ) পরিণত করাই তাঁহার ধর্মনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল। ধর্মান্ধতার বশবর্তী হইয়া তিনি হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর পুনরায় ধার্য করেন। হিন্দু ব্যবসায়ীদের উপর শুল্কের হার দ্বিগুণ করেন। হিন্দুদের ধর্মমেলাগুলি বন্ধ করিয়া দেন এবং হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ বন্ধ করেন। ধর্মান্ধতার বশবর্তী হইয়া ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সিয়া রাজ্য দুইটি ধ্বংস করিতেও দ্বিধা করেন নাই।

ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধ নীতির বিরুদ্ধে মথুরার হিন্দু জাঠগণ বিদ্রোহী হয়। হিন্দু মন্দির ধ্বংস করার প্রতিবাদে বুন্দেলখণ্ডের রাজপুতগণ বিদ্রোহী হয়। মোগলবাহিনী এই বিদ্রোহগুলি নির্মমভাবে দমন করে। ঔরঙ্গজেবের ধর্ম-নীতির বিরুদ্ধে শিখগণও বিদ্রোহী হয়। শিখদের ধর্মগুরু **তেগবাহাদুরকে** বন্দী করিয়া দিল্লীতে আনা হয় এবং তাঁহাকে হত্যাকরা হয়। ইহাতে সমগ্র শিখ সম্প্রদায় বিদ্রোহী হয় এবং পরবর্তী ধর্মগুরু **গোবিন্দ সিংহের** নেতৃত্বে মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। গুরুগোবিন্দ সিংহ শিখগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া **খালসা** (অর্থাৎ পবিত্র) নামে একটি সামরিক বাহিনী গঠন করেন। শিখগণ পাঞ্জাবে মোগলদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। সম্রাটের ধর্মান্ধতার ফলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে মোগলবিরোধী শক্তির অভ্যুত্থান ঘটে। ইহার ফলে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়ে।

ঔরঙ্গজেবের চরিত্র ও কৃতিত্বঃ ঔরঙ্গজেব কঠোর পরিশ্রমী, শিক্ষিত ও দক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি ছিলেন রাজোচিত গুণাবলীর অধিকারী ও ধর্মভীরু। তাঁহার নৈতিক চরিত্র ছিল খুব উন্নত। তিনি পবিত্র কোরাণের প্রতিটি উপদেশ নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। তাঁহার আদেশে রাজদরবারে নৃত্য-গীত, আমোদ-প্রমোদ নিষিদ্ধ হয়। অনেকে তাঁহাকে "রাজার পোশাকে সন্ন্যাসী" বলিতেন। কিন্তু পর ধর্মের প্রতি তিনি মোটেই উদার ছিলেন না। ঔরঙ্গজেব ছিলেন বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী। তিনি তুর্কী, হিন্দী ও পারসিক ভাষায় অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। কোরাণ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার দারুণ অশ্রদ্ধা ছিল।

ঔরঙ্গজেব ছিলেন উগ্র সাম্রাজ্যবাদী। সমগ্র উত্তর ভারতে একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া তিনি দক্ষিণ ভারতের এক বিরাট অংশে মোগল প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি সর্বত্র মোগল আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রায়ত্ত করিয়া তিনি সরকারী কর্মচারীদের স্বাভাবিক উদ্যোগ ও উদ্যম বিনষ্ট করিয়াছিলেন। ইহার ফলে সর্বত্র শাসনব্যবস্থা দুর্বল

হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার আমলেই মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন শুরু হয়।

মোগল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ঃ মোগল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা উন্নত ছিল। শাসন ব্যাপারে আকবর অনেক ক্ষেত্রে শেরশাহের শাসন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। সম্রাট ছিলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। রাজতন্ত্র ছিল স্বৈরাচারী। সম্রাট ছিলেন সামরিক ও বে-সামরিক বিভাগের সর্বোচ্চ অধিনায়ক। মন্ত্রী বা পরামর্শকদের পরামর্শ অনুসারে সম্রাট শাসন কার্য পরিচালনা করিতেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন **ওয়াজীর, দেওয়ান, মীর বক্সী, মীর সামান, সদর-উস-সুদুর** প্রভৃতি।

আকবর মোগল সাম্রাজ্যকে **১৫টি সুবা** (প্রদেশ)-এ ও প্রতিটি সুবাকে কয়েকটি **সরকার** (জেলা)-এ বিভক্ত করেন। প্রত্যেক সুবায় **সুবাদার** নামে একজন শাসনকর্তা ও একজন দেওয়ান বা রাজস্ব-সচিব থাকিতেন। সুবাদারগণ অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সুবার রাজস্ব আদায় ও শন্তিরক্ষা করা ছিল সুবাদারের প্রধান দায়িত্ব।

প্রত্যেক সরকারে একজন **ফৌজদার** নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার দায়িত্ব ছিল শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা। নগরের শান্তি রক্ষার ভার **কোতোয়ালের** হস্তে ন্যস্ত থাকিত। বিচার বিভাগের সর্বোচ্চে থাকিতেন সম্রাট। তিনিই ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত। সম্রাটের পরেই থাকিতেন **কাজী-উল-কাজাত**।

আকবরের আদেশে রাজা **তোডরমল** রাজ্যের সমস্ত জমি জরীপ করান এবং জমির উর্বরতা অনুসারে জমিগুলিকে চারিভাগে ভাগ করিয়া রাজস্ব নির্দিষ্ট করিয়া দেন। ফসলের এক-তৃতীয়াংশ ভূমি-কর হিসাবে ধার্য করা হয়।

মোগল শাসনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল **মনসবদারী** প্রথা। **মনসব** কথাটি হইতে মনসবদারী কথাটির উৎপত্তি। মনসব কথাটির অর্থ হইল পদমর্যাদা। পূর্বে রাজকর্মচারীগণকে বেতনের পরিবর্তে জায়গীর দেওয়া হইত। কিন্তু জায়গীর প্রথায় কর্মচারিদের আর্থিক ও

১০

স্থানীয় প্রতিপত্তি যেমন বৃদ্ধি পাইত, তেমনি সম্রাটের রাজস্বেরও ক্ষতি হইত। সুতরাং আকবর জায়গীর প্রথা উচ্ছেদ করিয়া মনসবদার নামে এক উচ্চশ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত করেন। মনসবদারগণ সরকার হইতে বেতন পাইতেন। ইহারা শাসনকার্যে সহায়তা করিতেন এবং সরকারকে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য সরবরাহ করিতেন। সামরিক ও বে-সামরিক উভয় বিভাগেই মনসবদার নিযুক্ত হইতেন।

মোগল যুগের সংস্কৃতি ঃ সংস্কৃতির দিক দিয়া মোগল যুগ ছিল উন্নত। এই যুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা ও সাহিত্যের খুব উন্নতি হইয়াছিল। নির্মাতা হিসাবে মোগল সম্রাটদের খ্যাতি ছিল। মোগল সম্রাটগণ হিন্দু ও মুসলমান শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সমান ভাবে সম্মান করিতেন। এই কারণে মোগল যুগে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। **কাবুলবাগ ও জামে মসজিদ** বাবরের স্থাপত্য-কীর্তির অন্যতম। শেরশাহ ভারতীয় স্থাপত্যকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার নির্মিত **সাসারামের সমাধি ও পুরাণা কেল্লা** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আকবরের সময় রাজপুত শিল্পী ও ভাস্করদের প্রাসাদ নির্মাণের কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। আকবরের আমলে নির্মিত আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রীর প্রাসাদগুলিতে হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্য-রীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। স্থাপত্য-নির্মাতা হিসাবে শাহজাহান ছিলেন মোগল সম্রাটদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শাহজাহানের আমলে **আগ্রা দুর্গ, তাজমহল**, দিল্লী দুর্গের **দেওয়ানে-আম, দেওয়ানে-খাস, জামে মসজিদ** মোগল যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীত

মোগল যুগে চিত্রশিল্পে ভারতীয় ও পারস্য রীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। বাবর ও হুমায়ুন চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই যুগে চিত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল রাজপুতানা ও গুজরাট। আকবরের আমলে একটি পৃথক চিত্রশিল্প বিভাগ স্থাপিত হয়। আকবর বহু হিন্দু ও পারসিক চিত্রকরদের নিযুক্ত করিয়াছিলেন। চিত্র সমালোচক হিসাবে জাহাঙ্গীরের খ্যাতি ছিল। জাহাঙ্গীর নিজেই চিত্র অঙ্কন করিতেন

এই যুগে রাজপুত চিত্রকলার যথেষ্ট উন্নতি হয়। পাঞ্জাবের কাংড়া অঞ্চলেও এই যুগে চিত্রকলার উন্নতি হইয়াছিল।

মোগল সম্রাটগণ সঙ্গীতেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আকবরের সঙ্গীত-প্রীতি সর্বজনবিদিত। হিন্দু ইরাণীয় প্রভৃতি জাতির গায়কগণ তাঁহার দরবারে বিরাজ করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে মিঞা **তানসেন** ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

মোগল সম্রাটদের প্রায় সকলেই বিদ্বান ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁহারা বহু মাদ্রাসা, মসজিদ ও হিন্দু শিক্ষায়তন নির্মাণ করিয়াছিলেন।

শিক্ষা ও সাহিত্য

আকবর আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রীতে কলেজ নির্মাণ করিয়াছিলেন। শিক্ষাপ্রসারের জন্য তিনি একটি বৃহৎ গ্রন্থাগারও নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই যুগে বহু ফার্সী গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। বাবর ও হুমায়ুনের আত্মজীবনী, আবুল ফজলের **আকবরনামা** ও **আইন-ই-আকবরী**, জাহাঙ্গীরের রচিত **তুজুক-ই জাহাঙ্গীরী** প্রভৃতি মোগল যুগের নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এই যুগে হিন্দী সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। সুরদাসের ব্রজ ভাষায় রচিত কাব্যগুলি এবং তুলসীদাস রচিত **রামচরিত মানস** হিন্দী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। মোগল যুগে বাংলা সাহিত্যেরও বিশেষ উন্নতি হয়। এই যুগেই বাংলায় বৈষ্ণব সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্য রচিত হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে **চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবৎ, চৈতন্য মঙ্গল** প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঃ বিশাল মোগল সাম্রাজ্যর পতনের সূচনা শাহজাহানের আমলে শুরু হয়, ঔরঙ্গজেবের আমলে উহা ধ্বংসের সম্মুখীন হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে উহা খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যায়। আকবর হিন্দুদের সহায়তায় ও সহযোগিতায় মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতার ফলে হিন্দুগণ অসন্তুষ্ট হয় এবং রাজপুতগণ মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। সাম্রাজ্যের পতনের আরও কারণ ছিল। মোগল সেনাপতিদের বিলাসিতা ও পারস্পরিক কলহ প্রভৃতি কারণে সৈন্যবাহিনী দুর্বল হইয়া

পড়িয়াছিল। ঔরঙ্গজেবের পরবর্তী সম্রাটদের চারিত্রিক দুর্বলতা ও শাসন বিষয়ে অযোগ্যতা সাম্রাজ্যের পতনের অপর কারণ। দক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়া ঔরঙ্গজেব সাম্রাজ্যের ক্ষতি করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইহা ছাড়া, পারস্য ও আফগানিস্তানের সম্রাটদ্বয় যথাক্রমে নাদির শাহ্ ও আহম্মদ শাহ্ আবদালীর ভারত আক্রমণ মোগল সাম্রাজ্যের উপর চরম আঘাত হানিয়াছিল। এইভাবে মোগল সাম্রাজ্য ক্রমেই ধ্বংসের পথে চলিয়া যায়।

শিবাজী ও মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থান ঃ পশ্চিমে আরব সাগর হইতে পূর্বে হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত দাক্ষিণাত্যের উপকূলকে সাধারণ ভাবে মহারাষ্ট্রদেশ বলা হইয়া থাকে। ইহা একটি পর্বতসঙ্কুল অঞ্চল। মধ্য যুগের প্রারম্ভে এই অঞ্চলে দেবগিরির যাদব বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতনের পর বাহ্মনী, আহম্মদনগর ও বিজাপুরের সুলতানগণ মহারাষ্ট্রদেশে রাজত্ব করিতে থাকেন। এই সকল রাজবংশের অধীনে সামরিক দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত থাকিয়া মারাঠাগণ সামরিক জাতি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করার সুযোগ পায়।

মারাঠা রাষ্ট্রের পূর্ব-ইতিহাস

প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ মারাঠাদের অভ্যুদয় ও চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। দেশ পর্বতসঙ্কুল ও ভূমি অনুর্বর হওয়ার ফলে মারাঠাগণ কঠোর পরিশ্রমী, কষ্ট সহিষ্ণু ও দুর্ধর্ষ হইয়া উঠে। মারাঠাদের মধ্যে বর্ণভেদ না থাকায় উহাদের সামাজিক বন্ধন ছিল সুদৃঢ়। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে মহারাষ্ট্রে ভক্তি আন্দোলনের ফলে মারাঠাদের মধ্যে গভীর জাতীয়তাবোধ ও একাত্মবোধ জাগিয়া উঠে। শিবাজী তাঁহার সংগঠনী শক্তির দ্বারা মারাঠাগণকে এক স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করিতে সমর্থ হন।

শিবাজী ঃ ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে শিবনের পার্বত্য দুর্গে শিবাজীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন শাহজী ভোঁসলে এবং মাতা জীজাবাঈ। শিবাজী বাল্যকালে মাতা জীজাবাঈ এবং দাদাজী কোণ্ডদেব নামে

এক ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। ধর্ম পরায়ণা মাতার প্রভাব শিবাজীর জীবনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে। মাতার নিকট রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী শুনিয়া বাল্যকালেই শিবাজীর মনে বীরত্ব ও দেশপ্রেম সঞ্চারিত হয়। মাতার ন্যায় কোণ্ডদেবও শিবাজীর চরিত্র গঠনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

কিশোর বয়সে শিবাজী পার্বত্য মাওয়ালী জাতীয় লোকদের লইয়া একটি নিজস্ব সৈন্যদল গঠন করেন। বাল্যকাল হইতেই শিবাজী একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। কিন্তু দাদাজী কোণ্ডদেবের জীবিতকাল পর্যন্ত শিবাজী এই বিষয়ে কিছুই করিতে পারেন নাই। ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দাদাজী কোণ্ডদেবের মৃত্যু হইলে শিবাজী রাজ্য জয়ে মনোনিবেশ করেন। মুসলমান শাসকদের অধিকার হইতে মহারাষ্ট্রকে উদ্ধার করাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। সম্পদের লোভে লুঠতরাজ করা তাঁহার আদর্শ ছিল না।

শিবাজীর রাজ্য জয়

শিবাজী প্রথমে বিজাপুর রাজ্যের কয়েকটি দুর্গ দখল করেন। বিজাপুরের সুলতান শিবাজীকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার পিতা শাহজীকে কারারুদ্ধ করেন। সুতরাং কিছুদিন শিবাজীকে যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে বিরত থাকিতে হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে দাক্ষিণাত্যের মোগল শাসনকর্তা ঔরঙ্গজেব বিজাপুরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলে শিবাজীর সুযোগ আসে। তিনি পুনরায় বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। বিজাপুরের সুলতান শিবাজীর বিরুদ্ধে সেনাপতি আফজল খাঁ-কে প্রেরণ করেন। আফজল খাঁ প্রতারণার আশ্রয় লন। তিনি শান্তির জন্য শিবাজীকে আমন্ত্রণ জানান। শিবাজী আফজল খাঁ-র দুরভিসন্ধির কথা পূর্বেই জানিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি প্রস্তুত হইয়াই আফজল খাঁ-র শিবিরে আসেন। আফজল খাঁ আলিঙ্গনের সুযোগে শিবাজীকে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত হইলে শিবাজী লৌহ-নির্মিত 'বাঘনখ' নামক অস্ত্রের সাহায্যে আফজল খাঁ-র বক্ষ বিদীর্ণ করেন। সেনাপতির মৃত্যুতে

বিজাপুরের সহিত সংঘর্ষ

বিজাপুর বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়। শিবাজী কোলাপুর ও দক্ষিণ কোঙ্কণ দখল করেন।

ইহার পর মোগলদের সহিত শিবাজীর দীর্ঘ সংগ্রাম শুরু হয়। সম্রাট ঔরঙ্গজেব শিবাজীর বিরুদ্ধে সেনাপতি সায়েস্তা খাঁকে প্রেরণ করেন। শিবাজী অতর্কিতে সায়েস্তা খাঁর শিবির আক্রমণ করেন। মোগলবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। শিবাজী সুরাট বন্দর লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর ধনরত্ন লাভ করেন। ইহার পর মোগল সেনাপতি জয়সিংহের সহিত শিবাজীর যুদ্ধ হয়। শিবাজী পরাজিত হন। জয়সিংহের অনুরোধে শিবাজী আগ্রায় আসেন। কিন্তু সম্রাট ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে অপমানিত করিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখেন। কিন্তু শীঘ্রই শিবাজী কৌশলে আগ্রা হইতে পলায়ন করিয়া নিজ রাজ্যে ফিরিয়া আসেন। ইহার পর রায়গড় দুর্গে শিবাজীর অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তিনি ছত্রপতি উপাধি ধারণ করেন। পুনরায় মোগলদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ শুরু হয়। তিনি মোগলদের নিকট হইতে তাঁহার হৃত দুর্গগুলি পুনরুদ্ধার করেন। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যু হয়।

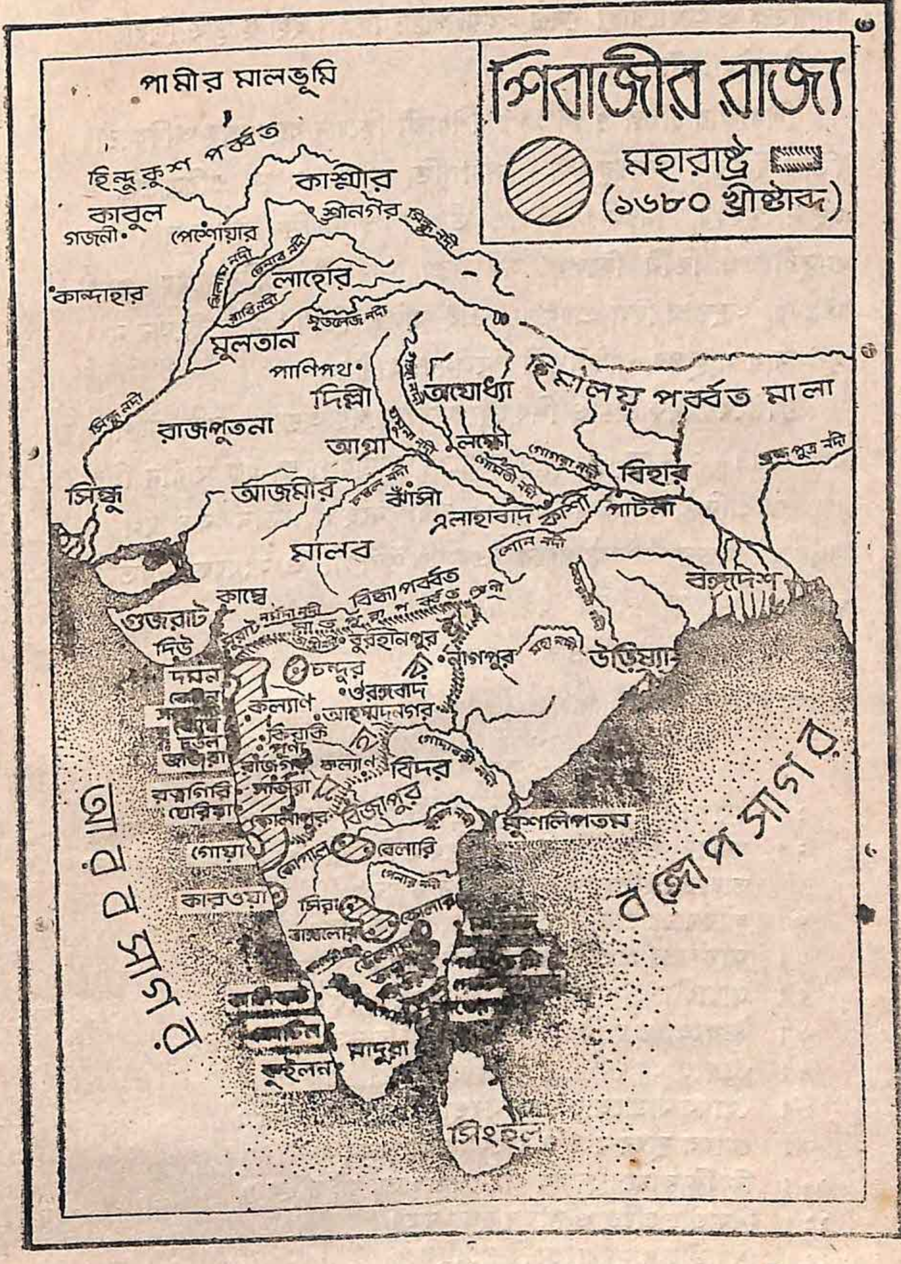
মোগলদের সহিত সংঘর্ষ



শিবাজী

শিবাজীর শাসনব্যবস্থা: সুদক্ষ শাসক হিসাবে শিবাজী খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন প্রজা কল্যাণকামী শাসক এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। শাসনকার্যে তাঁহাকে সাহায্য করার জন্য **অষ্ট প্রধান** বা আটজন মন্ত্রীর একটি সভা ছিল। প্রধানমন্ত্রীকে বলা হইত পেশোয়া। শিবাজী সমগ্র রাজ্যটিকে চারিটি **প্রান্তে** বা প্রদেশে বিভক্ত করেন। তাঁহার প্রতিটি প্রদেশ কয়েকটি তরফে বিভক্ত ছিল এবং প্রতিটি **তরফ** কয়েকটি গ্রাম লইয়া গঠিত ছিল। গ্রামের শাসনভার পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত থাকিত। উৎপন্ন ফসলের একশত ভাগের ত্রিশভাগ রাজস্ব হিসাবে ধার্য ছিল। কৃষির উন্নতির জন্য সময় সময় কৃষকগণকে ঋণ দেওয়া হইত। শিবাজী প্রতিবেশী রাজ্যের

প্রজাদের নিকট হইতে চৌথ (রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ) ও সরদেশমুখী



(রাজস্বের এক-দশমাংশ) নামে দুই প্রকার কর আদায় করিতেন।

শিবাজী এক স্থায়ী সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনী পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া গঠিত ছিল। ইহা ছাড়াও শিবাজীর একটি নৌবাহিনী ছিল।

শিবাজীর চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ শিবাজী ছিলেন বহুগুণের অধিকারী। তিনি ছিলেন সমরকুশলী সেনাপতি, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, চরিত্রবান ও মহান নেতা। নিরক্ষর হইয়াও তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। চাতুরীতেও তিনি ছিলেন অসাধারণ পারদর্শী। হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল প্রবল। তাই বলিয়া তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন না। মুসলমান সাধুদের প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল।

কৃতিত্বের দিক দিয়াও শিবাজীকে মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি বলা যায়। সামান্য এক জায়গীরদারের পুত্রের পক্ষে এক স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা কম গৌরবের কথা নহে। তিনি বহু দল ও উপদলে বিভক্ত মারাঠাগণকে এক শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রাজ্যশাসন ও সামরিক সংগঠনে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন প্রজাকল্যাণকামী শাসক।

অনুশীলনী

১। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান ?
২। হুমায়ুন ও শেরশাহের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে কি জান ? শেরশাহ কি জন্য ভারতের ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করেন ?
৩। আকবরের রাজ্য বিস্তার সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৪। আকবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর।
৫। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের চরিত্র সম্বন্ধে কি জান ?
৬। ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি ও উহার ফলাফল বর্ণনা কর।
৭। ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতির ফল কিরূপ হইয়াছিল ?
৮। মোগল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৯। মোগল যুগের সংস্কৃতি সংক্ষেপ বর্ণনা কর।
১০। কি কি কারণে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল ?
১১। শিবাজীর চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর।
১২। শিবাজীর শাসনব্যবস্থা কিরূপ ছিল ?

পরিশিষ্ট

Objective Tests

(ক)

শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলির যথোচিত অর্থ সম্পূর্ণ কর ঃ—

১। ভারতের আদিম অধিবাসীগণকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা— — —।
২। নূতন প্রস্তর যুগের পর শুরু হয় — যুগ।
৩। সিন্ধু উপত্যকায় — সভ্যতার উন্মেষ হইয়াছিল।
৪। সিন্ধু সভ্যতার পর — সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল।
৫। আর্যদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের নাম —।
৬। বেদ চারিটি গ্রন্থে বিভক্ত, যথা— — — —।
৭। উপনিষদের অপর নাম —।
৮। বেদাঙ্গ ও ষড়দর্শন একত্রে — নামে পরিচিত।
৯। গৌতম বুদ্ধের পিতার নাম ছিল —।
১০। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন —।
১১। জৈন ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন —।
১২। হর্যঙ্ক বংশের দুই খ্যাতনামা রাজা ছিলেন — —।
১৩। হর্যঙ্ক বংশের পর মগধে — বংশ রাজত্ব করে।
১৪। মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন —।
১৫। মৌর্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন —।
১৬। কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ ছিলেন —।
১৭। গুপ্ত বংশের প্রথম সার্বভৌম রাজা ছিলেন —।
১৮। হর্ষবর্ধন —সিংহাসনে — খ্রীষ্টাব্দে আরোহণ করেন।
১৯। হর্ষবর্ধনের আমলে চৈনিক পরিব্রাজক — ভারতে আগমন করেন।
২০। বাংলার প্রথম সার্বভৌম রাজা ছিলেন —।
২১। ধর্মপাল ছিলেন — বংশের রাজা।
২২। লক্ষ্মণ সেন ছিলেন — বংশের রাজা।
২৩। অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা ছিলেন —।
২৪। যবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহারের নাম —।
২৫। সুলতান মামুদ শাহী বংশের রাজা — কে পরাজিত করেন।
২৬। — যুদ্ধক্ষেত্রে মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করেন।
২৭। রামচরিত গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন —।
২৮। চালুক্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন —।
২৯। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন —।

৩০। মক্কার প্রধান ধর্ম মন্দিরের নাম —।

৩১। দিল্লীর দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম —।

৩২। বাংলার ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন —।

৩৩। বাবর ও — মধ্যে প্রথম পাণিপথের যুদ্ধ হয়।

৩৪। বাবরের পুত্র — শেরশাহের নিকট পরাজিত হন ও দিল্লীতে — বংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

৩৫। মোগল সাম্রাজ্যের শেষ সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন —।

৩৬। শিবাজী — সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল — ও মাতার নাম —।

(খ)

যে উত্তরটি শুদ্ধ সেটির নীচে দাগ দাও :—

১। সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল—গাঙ্গেয় উপত্যকায়, সিন্ধু উপত্যকায়।

২। আর্যদের আদি নিবাস—মধ্য এশিয়া, ভারত।

৩। কোন্ ভারতীয় নৃপতি আলেকজাণ্ডারকে বাধা দিয়াছিলেন ?— অম্ভি, চন্দ্রগুপ্ত, পুরু, চাণক্য ?

৪। মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—বিম্বিসার, অজাতশত্রু, চন্দ্রগুপ্ত।

৫। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে কোন্ বিদেশী পর্যটক ভারতে আসিয়াছিলেন ?—মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়েন, মাহুয়ান।

৬। শশাঙ্ক কোন্ রাজ্যের রাজা ছিলেন ?—অঙ্গ, বিদেহ, গৌড়।

৭। দিল্লীর সুলতানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—মামুদ গজনী, ইলতুৎমিস, কুতব-উদ্দিন।

৮। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়—বাবর ও শেরশাহের মধ্যে, বাবর ও সংগ্রাম সিংহের মধ্যে, বাবর ও ইব্রাহিম লোদীর মধ্যে।

৯। দীন-ইলাহি ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন—হুমায়ুন, আকবর, ঔরঙ্গজেব।

১০। চৌথ ও সরদেশমুখী কর ধার্য করিয়াছিলেন—আকবর, ঔরঙ্গজেব, শিবাজী।

(গ)

নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি সময়ানুক্রমিকভাবে সাজাও :—

১। ধাতুযুগ, নূতন প্রস্তরযুগ, পুরাতন প্রস্তরযুগ।

২। আর্য সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা, গুপ্ত সভ্যতা, মৌর্য সভ্যতা, মোগল রাজত্ব, সুলতানি রাজত্ব।

৩। ভারতে কুষাণ আক্রমণ, গ্রীক আক্রমণ আরব আক্রমণ, হূণ আক্রমণ, মামুদ গজনীর আক্রমণ।

৪। খানুয়ার যুদ্ধ, পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ, তরাইনের প্রথম যুদ্ধ।